# কৃশানু

একটি মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

আটান্ন বর্ষ, ১৪৩২

**শারদীয়া**




ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে।

# কৃশানু

একটি মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

শারদীয়া ১৪৩২


**সম্পাদক – মনন দাস**

**সহ সম্পাদক – সৌরভ পাঁজা ও প্রমিত্র রায়**

৩০/১এ, কলেজ রো, কোলকাতা ৭০০০০৯

krishanupatrika@gmail.com

# সূচিপত্র



**প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ – রেবা মুখার্জী** **প্রচার ও জনসংযোগ – ডাঃ সমীর কুমার বেতাল**



## সম্পাদকীয়

গঙ্গার তীরে বসে হরিপ্রসাদ ও আমি যেদিন পত্রিকা প্রকাশ করব মনস্থ করেছিলাম, তারপর গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে, চলে গেছে আটান্ন বছর...

হরিপ্রসাদ মাত্র বছর দুয়েক পরেই চলে গেল পরপারে। যাঁদের নিয়ে পথচলা শুরু করেছিলাম, তাঁদের মধ্যে দীনেশ চন্দ্র সিংহ দীর্ঘকাল সম্পাদনার কাজ করে পরপারে চলে গেছেন সেও হয়ে গেল কত বছর...। চলে গেছেন অনেকেই। আছেন প্রবীর সাহা আর শ্যামল বসু - দুজনেই বার্দ্ধক্যে অসুস্থ।

আমি এখনও হাল ধরে আছি। চেষ্টা করছি নবীনদের দায়িত্ব দিয়ে কৃশানুকে শতায়ু করার পথে এগিয়ে দিতে। আশা নিয়ে শত বর্ষ পার করেও কৃশানু এগিয়ে চলবে। আপাতত এগিয়ে চলেছি হীরক জয়ন্তীর দিকে...মাত্র দু'বছর....তারপরই ষাট !

অসংখ্য বন্ধুদের সহযোগীতায় কৃশানু এগিয়ে চলেছে। ধন্যবাদ বন্ধুরা।

- মনন দাস

# ক বি তা মা লা ১

---

**পটে, ক্যানভাসে**

**শান্ত রায়** ( জন্ম ১৯৫৩, মৃত্যু ২০২৩ )

**(একটি অপ্রকাশিত কবিতা** )

এই রাত্তিরে, হাওয়ায়
মেঘরঙে তুলি ডুবিয়ে
আকাশের পটে আঁচড় দিয়েছে কে-বা ?

দোলে অসংখ্য তারা
আকাশের ক্যানভাসে
সারারাত ধ'রে
চিত্রের পর চিত্র দেখতে থাকি...
আকাশের পটে দিয়েছো আঁচড় -
কে তুমি ?

**বিজয়ীর মালা * সুদামকৃষ্ণ মন্ডল**

যদি নিভে যেতাম  ছাই হতেই হতো
জ্বলছি বলেই না দীপ্তমান ।

হারিয়েছি বহুধা  কিছুই
ফুলের মালা পরাতে আসেনি কেউ।
বিজয়ের মালা অভিষেকে দিয়েছে কেউ
পরাজয়ী কু-চক্রীর দ্বারা পরাভূত শোকাহত !
চিরকাল সহমর্মী হয়নি কেউ।

প্রস্ফুটিত মালা লোকে খোঁজে
কুঁড়ি থাকে হতাশায় দুশ্চিন্তায়।

**বিষাদ  নৈঃশব্দ *  ধ্রুব বসু**

বহুদিন পরে আবার
মুখের ছবি দিয়েছো ফেসবুকে
যেন কাঞ্চনজঙ্ঘা উঠল জেগে
মেঘবিবরের বুকে।
বহুদিন হয়ে গেছে
এ জীবন ছেড়ে চলে গেছো আজ দূরে
তবু সোনার সীতা গড়িয়ে রেখেছি
হৃদয়-অন্তঃপুরে।
বহুদিন কেটে গেল
এভাবে স্মৃতি-পরাধীন হয়ে বাঁচি
যেন জাহাজঘাটে বাজে শুধু
উতল জাহাজবাঁশি।
বহুদিন আজ গত
মন হয়ে গেল আলোকবর্ষ পার
তোমার সন্ধানে
কত দিবস কত রজনী কাটল অনুমানে।
বহুদিন হল পার
তোমার সঙ্গে আঁখিরঙ-মিলন
হল না আরেকবার।

## নীল তারা * রাকা ভট্টাচার্য

তোমায় নিয়ে ভাবব বলে বিকেল খুঁজি।
আলসে ঘেঁষে নীলচে আলো নামলো বুঝি।

ভাবলে তোমায় মনের দুয়ার দি খুলে দি।
ছলাৎ ঢেউয়ে ভাসতে থাকি একলা নদী।

ভাবতে গিয়ে জুঁইয়ের সুবাস সন্ধ্যা আনে।
নীলচে তারা হাতছানি দেয় পূবের কোণে।

ভাবছি তোমায় তবুও এখন শূন্য ছাদে।
দখিন মলয় জড়িয়ে আঁচল ফুঁপিয়ে কাঁদে।

ভাবতে ভাবতে দিচ্ছি পাড়ি পাহাড় ধূসর।
কোন বিদেশী ডাকছে ভীষণ সাজিয়ে বাসর।

ভাবছি যখন দূরের পাখি শিস দিয়ে যায়।
ডাকছ কাছে ? বলছ নীলে আয় চলে আয় ?!

ভাবছি চলে যাবই যাব তারার দেশে।
মন বসে কি ! ডাকলে এমন সাঁঝের শেষে !!



## অমানুষ * রীতা ব্যানার্জী

মানুষ নামে আছে যারা যত
সবাই কি আর মানুষ হবার মত ?
কেউ তো মানুষ নামেই দেখি আছে
কেউ বা আবার ঘোরে মানুষের পিছে !
হয়তো কেউ বা মানুষেরই মতো সাজে,
অমানুষও থাকে মানুষের মাঝে।
আমি তুমি থাকি যখন ভ্রমে...
অমানুষগুলো সিধে হয়ে যায় ক্রমে !
যতই তা সে মানুষ সেজে থাকুক
গায়ে যতই আতর-গন্ধ মাখুক।
অমানুষের গন্ধ কি তার ঢাকে ?
অমানুষ তো অমানুষই থাকে।

## কবিতা বৈপরীত্য * শ্রুতি সামন্ত

আমার উঠোন জুড়ে শুধু আদুরে আলাপন,
ভেসে যাবার নেই যে নৌকো,
মানসতরীতে পাঠালাম আমার গোপন
বিহার,
আকাশের অখণ্ডতায় ভরেছে মন।
ছড়ানো, হারানো চিঠির মাঝে দিনগুজরান,
সময় যেন বৈপরীত্যের খেলা,
থামেনা তো যাপন,
চিত্ত আমার উদাস বাউল,
নামছে ক্ষেতে দেখতে সবুজ,
দিগন্ত জুড়ে রক্তিম আভায়,
সূর্যের আলো নতুন আকাঙ্খায়,
বার্তা দেয় গৃহকোণে ফিরে যাবার,
ঘরছাড়া এই মনকে আবার নির্বাসনে
পাঠাই।

## সুখ-অসুখ * মধুছন্দা গাঙ্গুলী

টিনের ছাউনি, এক চিলতে রোদ এসে পড়েছে বারান্দায়....
বারান্দার এক কোণে দু'টো ইঁট পেতে কিছু শুকনো কাঠখড় পুড়িয়ে চলছে ভাত রান্নার তোড়জোড়।
টগবগ করে ফুটছে ভাত, ফুটন্ত ভাতের গন্ধে খিদের অসুখটা দ্বিগুণ বেড়ে যাচ্ছে... !
খিদের জ্বালাটা পেট থেকে ধীরে ধীরে মস্তিষ্ককে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে... !
ক্ষুধা নিবৃত্তির সুখটা আঁকড়ে ধরেছে গরম ভাতের ম-ম করে ছেয়ে যাওয়া গন্ধটাকে।

বাইরে কিসের কোলাহল !!! বারান্দা পেরিয়ে ছুটে যাই সেদিকে....যতদূর চোখ যায়....পুড়ছে শহর, পুড়ছে চারিদিক... !
আগুন নেভানোর জল নেই,
দু'চোখ উপচে বেরিয়ে আসে জল !
এরকম শত-শত অশ্রুকণায় এই আগুন তো নেভার নয় !

খিদেটা যেন আবার চাগাড় দিয়ে উঠলো....ছুটে আসি বারান্দায়,
দু'টো ইঁটের মাঝে কাঠখড় পুড়ে ছাই... ! হাঁড়ির তলানিতে দলাপাকানো পুড়ে যাওয়া কালো ভাত !

## খরা * রাজীব পাল

আমি তো প্রেমিক হতেই চেয়েছিলাম
জলে ডোবা ক্ষেত, অপটু সাঁতার
এক-হাঁটু কাদার কলঙ্কে চাষার ছেলে
গামছা পেতে শুয়ে থাকবো কখনও
ঘাস-ফুলে লিখবো সেসব মায়া রোদ...

আকাশ কালো হয়ে এলে
একবুক ময়ূর পেখম তুলেছে বাতাসে
বীজের ঘুমে বাজিয়ে গেছি আত্মবিশ্বাস
দুঃস্বপ্নের ভেতর তুমি রেডিও স্টেশন
ছড়িয়ে দিচ্ছো খরার বার্তা...
আমি তো প্রেমিক হতেই চেয়েছিলাম
এক হাঁটু কাদার কলঙ্কে চাষার ছেলে।

## শূন্য * জয়িতা ঘোষ হালদার

ইচ্ছে করে ভিনদেশী এক তারা হয়ে যাই
ইচ্ছে করে মেঘলা ডানায় মেঘ চুমুকে চাই
ইচ্ছে করে রঙিন খাতায় স্বপ্নগুলো নতুন করে সাজাই
ইচ্ছে করে বিষাক্ত হেমলকেই তোকে ডোবাই
ইচ্ছে করে দুঃশাসনের হাতদু'টোকে ভালো করে পোড়াই
ইচ্ছে করে গান্ধারীর চোখের বাঁধন সরাই
ইচ্ছে করে কান্না মুছে একটু আগুন জ্বালাই
ইচ্ছে করে ঝলসানো শব নতুন করে সাজাই
ইচ্ছে করে বোবা মুখে একটু ভাষা জোগাই
ইচ্ছে করে করতে আড়ি, ভুলতে তোকে চাই।
ইচ্ছে করে বহুরূপীর ছদ্মবেশ সরাই
ইচ্ছে করে প্রহসনের শেষ বিচারে সোচ্চার হয়ে যাই
ইচ্ছেরা সব দিনের শেষে করছে ভীষণ লড়াই ।

## সোহাগ রাত * বিকাশ যশ

বন্দী করেছ বন্ধু আমায়
সন্ধি করেছ প্রিয়ে
জড়িয়ে রেখেছ বুকের মাঝে
সোহাগ আদর দিয়ে।

ডিমিডিমি সুরে বেজেছে মাদল
বাদল এসেছে নেমে
মনের আঁধারে উঠেছিল ঝড়
সে ঝড় গিয়েছে থেমে।

প্রেমের পরশে ফুটেছে যে ফুল
সাজিয়ে রেখেছি বুকে
চকিত নয়নে দেখেছি তোমায়
গালভরা হাসি মুখে।

খেয়ালের স্রোতে ভেসেছি দুজন
গিয়েছি অনেক দূরে
রাতের আকাশে মিটিমিটি তারা
ছিলে তুমি মনজুড়ে।

কানেকানে কতো বলেছিলে কথা
রেখেছিলে হাতে হাত
সেদিনও ছিল শুক্লা তিথির
এমনি চাঁদনী রাত।

## দীর্ঘ পথ হেঁটে পাড়ি দেওয়ার পর
## দুর্গা শংকর দাস

মৃদু আলোতে যে গাছটি ভেসে উঠলো
মৃদু আলোতে যে পথটি ভেসে উঠলো
দুই ক্ষেত্রেই শাখা পাতা গুলো স্পষ্ট নয়
কেবল তারা অল্প ভিড়ের ভেতর ছায়াময়
কোনো রাক্ষুসে মুখের গ্রাস হয়নি সে সব
কোনো শত্রুর মুখ মনে পড়ে না
কোনো খানা গর্ত ভরা রাস্তার কথা মনে নেই
অথচ কুয়াশা ওড়ে
পূর্ব জন্ম উবে যায় না
আর এক পৃথিবী নীল নীরবতা, পিরামিড,
শঙ্খনীল ভূমি, নিকট বিন্দুর মিটমিট
নক্ষত্রের খসে পড়া জেগে থাকে...



## বাঁধন হবো * সোমা নায়ক

এবার আমি লিখব না আর প্রেমের চিঠি
এবার বরং তোর যাপনের সঙ্গী হবো।
আকাশ যেমন রোদের আলোয় পূর্ণ থাকে
ঠিক তেমনি তোর সাথে মন জড়িয়ে রবো।

এবার তোকে ডাকব না আর নিজের কাছে
আমিই বরং পৌঁছে যাব তোর ঠিকানায়।
আমায় দেখে আচমকা তুই চমকে যাবি ?
চাই না তোকে রাখতে, প্রিয়, আর দোটানায়।

এবার বরং তোর বিরহে কাঁদব না আর
তার চে' আমি ফল্গু হবো তোর হৃদয়ে।
মনখারাপের ঝর্ণা যখন বইবে দ্রুত
বন্ধু হবো, অস্তে কিংবা রোজ উদয়ে।

এই পৃথিবীর দুই কোণাতে দু'জন মানুষ
ইচ্ছে, এই দূরত্বটা মিটিয়ে দেবো।
ঢের হয়েছে দূরে থাকা, একলা রাখা
ভুলভ্রান্তি ভুলেই প্রেমের বাঁধন হবো।

## আগমন * সৌরভ পাত্র

আলোর ঝর্ণাধারা ও পুষ্প সৌরভ
দিকে দিকে উৎসবের উন্মাদনা রব।
নবরূপ সাজে সেজে ওঠো তুমি, মা
তোমার আগমনে অমানিশিও পূর্ণিমা।
জগৎ জুড়ে মা তোমার মহিমা অপার
তুমি ছাড়া অশান্তিতে এ বিশ্বসংসার।
ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে বরণ করি, মা
তোমার আগমনে অমানিশিও পূর্ণিমা।

## সবুজের বুকে প্রেম * স্মৃতি সাহা

আমি অবাক হয়ে দেখি,
বৃক্ষরাও মানুষের মতো সাজে বাহারি পাতায়,
ওরা যেন কষ্টের দাগ বয়ে বেড়ায়।
মানুষের মতো প্রকাশ নেই,
কিন্তু অনুভূতিদের পুষে রাখে সংগোপনে।

আমি মুগ্ধ হয়ে থাকি ,
সবুজের বুকে হলুদ পাতা নকশা আঁকা।
ওরাও হাসে, কাঁদে  কখনও উল্লাসে ঝলমল
করে ওঠে,
নিঃস্বার্থ ভালোবাসে।

**উত্তর দিও * বৃষ্টি ( পলি ঘোষ )**

মনের গভীরে যে গোপন ইচ্ছা
যে আকর্ষণী টান...
ধূসর জীবনে হঠাৎ আগমনী গান
সেকি তোমার জন্য নয় ?
উত্তর দিও।

জীবনের ওঠাপড়া ঘাত-প্রতিঘাতে
ছন্দবিহীন জীবনের এক রঙিন প্রভাতে
ছন্দের আগমন
সেকি তোমার জন্য নয় ?
উত্তর দিও।

এলোমেলো মনের সুচারু কল্পনা
রিমঝিম বৃষ্টিতে রামধনুর আল্পনা...
সেকি তোমার জন্য নয় ?
উত্তর দিও।

যতো ভালোবাসা, যতো আশা নিরাশা
এত দোলাচল অস্থির স্রোতে ভাসা।
সেকি তোমার জন্য নয় ?
উত্তর দিও।

**খবর এখন * কেতকী বসু**

সময় যখন খবর হয়
আড়াল তখন সরে যায়
কথাগুলো যখন ভারী হয়ে আসে
ঠিকানা তখন সঠিক করে বলা না গেলেও
বোঝা যায় কথাগুলো ভীষণ ভারী
অনুপযুক্ত খেলার সঙ্গী ছিল যে সময়
সেও আজ ঘুমিয়ে পড়েছে অন্ধকারের চাদর গায়ে দিয়ে
কিছু বোঝার আগেই চুপিসারে চলে গিয়েছে
বেঁধে থাকার সাহস হারিয়েছে একাত্ম না হয়ে
সময় বলে দিয়েছে, এরা কেউ বুঝতে আসেনা
বোঝাতে আসে সময়ের বৈচিত্র্য

ভারী বাতাস হালকা হয়েছে, সরে গিয়েছে অন্ধকার
বুঝেছি শুধু অকারণে সময় গিয়েছে শেষ হয়ে
তাই অহেতুক সময়কে গুরুত্ব না দিয়ে ভালোবেসেছি

**আলো * গণেশ ভট্টাচার্য**

তুমি ছুঁয়ে দিলে
শরীর আকাশ হয়ে ওঠে
আমার অপূর্ব ঘুম পায়
ঘুমের মধ্যে আমি জেগে থাকি ।
জেগে থাকি, স্বপ্ন দেখি
মন খুঁজি
একটি নতুন মন, মৃদু কথা
নিজেকে ভরিয়ে তুলি অন্য বাতাসে...
তুমি কাছে এলে
আলো হয় আমার সংসার,
কত কথা, কত বার কথা
তোমার প্রশ্ন শুনে মনে হয় রোদের জিজ্ঞাসা ।

## ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য * মহুয়া গাঙ্গুলী

আড়ষ্টতা এটা... ! জিহ্বা শাব্দিক অর্থ চয়নে,
নাহ্, আড়ষ্টতা নয়তো সন্ত্রস্ত,
তবে যে বলো নির্ভীক তুমি,
"পিছলে পড়তেও পারো, "স্লিপ অব্ টাং"
ওটা নির্ভরতাকে আষ্টেপৃষ্ঠে পেলে।
বেশ ;
কথাগুলো কিন্তু মগজের কড়া নাড়ছে :
চোখ তো স্পর্শ করে দৃষ্টিকোণ
কান থাকে আমার অনুরণনে,
তবে কেন এতো অহঙ্কারী তুমি !...
শুধু জিভ হয়েই খুশি, ইচ্ছা পোষণ করো বলেই
দাম দিতে হয় পুরো জীবন যদি,
আষ্টেপৃষ্ঠে নির্ভরতা নয় বরং তোমাকেই বেঁধে চলি আগে....
জবাবটুকু অন্তর কুরে-কুরে   মগজই সময়ের পোড়ো মন্দির হোক।
হঠাৎ যখন দৃষ্টি ছোঁবে তোমায়
অস্ফুটে এক শব্দ দেখবে আলোলিকা ভোর।
সেদিন তুমি নির্ভীক অন্তরে আমার
নির্ভরতা নয় ওষ্ঠ আসনে আদর।

## বিশল্যকরণী * কৃষ্ণা চক্রবর্তী

থেকে গেছে কত কথা পদ্মের পাতাতে,
মুক্তোর আকারে বাঁচে মৃত্যুর আশাতে।
জমেছে অণুতে রেণু ঘাসের মাথাতে,
সাত রঙ ঝরে পড়ে খুশির ভাষাতে।

ছলনা ছলকে পড়ে ব্যথা ভরে মনে,
আঘাতে আঘাত সয় ক্ষত শত কোণে।
জ্বালানি হয়েছে নারী প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
বিকেছে পুরুষ কত ফেলা বর-পণে।

ভালবাসা আছে, তবু ভালো বাসা নেই,
দগ্ধতার হাতে থাকে সুতুলির খেই।
মমতার আঁচ লাগে আঁচলেতে যেই,
আঁধারের অঞ্জলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেই।

চিরতরে ভেঙে গেছে মানবী ধরণী,
উপশমে কাজ দেবে বিশল্যকরণী।

## উজানস্রোত * তপন মুখার্জি

হঠাৎ বৃষ্টি এলে সব চিন্তা ধুয়ে যায় বিষন্নতায়। নিংড়ে আনে স্মৃতির নির্যাস। চোখের তারায় ভাসে সীতা- গীতা- সুজাতারা।
ছিঁচকাঁদুনে বৃষ্টি, এলোমেলো বাতাসে বানভাসি দু'চোখ, টিমটিম আলো পালতোলা নৌকোয়।
কত নদীবাঁধ, ময়দান, নন্দন চত্বর। কত মিঠেকড়া দিন, পলাশের রং, শাড়ি-প্যান্টে চোরকাঁটা। কত ঘাস, বাদাম, পাপড়িচাট।
টুকরো টুকরো কথায় সূর্যাস্তের চিঠি। শূন্য সময়ের চন্ডীমন্ডপ জুড়ে সানাই। বোতামখোলা বুকে ধারালো বাতাসের ঝাপটা।
ছেঁড়া নীল খাম ওড়ে বৃষ্টি হাওয়ায়। বড় বেশি শূন্য হয়ে যাই, ভেঙে চুরমার হয়ে যাই, দগ্ধ হয়ে যাই উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে।

## আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন * পিঙ্কি ঘোষ

আকাশ ছোঁয়ার ইচ্ছে ছিল খুব
তাইতো এক বর্ষায় মেঘবালিকা হলাম,
ঢেকে দিয়েছিলাম গোটা আকাশটাকে
আমার কৃষ্ণকলি আঁচল দিয়ে।
তারপর...
নিজের অজান্তে কখন যেন নদীর
বুকে ঝাঁপ দিয়ে সাগরে মিশে গেলাম,
নদীর কাছে জানলাম -
বৃষ্টি নামের মৃত্যুটা আমাকে মাটিতে
নামিয়ে এনে তার বুকে ফেলেছে।
মেঘবালিকা আকাশকে ঢাকতে পারে,
আকাশকে ছুঁতে পারেনা কোনোদিনও।
ছেলেবেলা কেটে গেছে -
মেঘবালিকা হতে চাওয়ার স্বপ্নটা ফেরারী হয়েছে,
কেউ কথা রাখেনি-র মহামিছিলে তুমিও সামিল।
মেঘবালিকা আজ বোঝে -
আকাশ অস্তিত্বহীন, শূন্য, অনন্ত।
তবে তুমি কি জানো ?
বরুণার বুকে মাংসের গন্ধ থাকলেও
ভালোবাসার জীবাশ্ম আজও আছে।

## মড়ক * মিলি দাস

এ বাড়িতে আর কখনও বিয়ের সানাই বাজবে না
কৃষ্ণ-সন্ধ্যায় আনন্দ জোয়ার নেমে আসবে না
শূন্য গর্ভ ফুঁপিয়ে ওঠে কান্নায়
মৃত্যুর মহাযজ্ঞ শুরু হয়েছে
জন্মদিনের কেক কাটা হবে না
বিবাহবার্ষিকী হবে না
একের পর এক তিলাঞ্জলি দেবে
ওঁ গঙ্গা ওঁ গঙ্গা ওঁ গঙ্গা
শুধু শ্রাদ্ধের পর শ্রাদ্ধ
জটায়ুর মতো উড়তে থাকে অনিচ্ছার মহড়া
ভাঙা আয়নায় এখন গ্রহণ লেগেছে
সেই ছোটবেলা ঠাকুমার কাছে
শুনেছিলাম পাশের পাড়াতে মড়ক লেগেছে,
জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সেটা আবার কি ঠাম্মা ?
বলেছিলেন, তা তো তোমার জেনে কাজ নেই,
তোমার কাজ তুমি করোগে যাও।
আজ বুঝি, এ তুলসীতলায় আর কোনোদিন কেন
কোনো প্রদীপ জ্বলে না।

## বকুলগন্ধী মন * রুমকী দত্ত

একলা সঙ্গোপনে, বকুলগন্ধী মনে
জ্যোৎস্নার কাছে যাই
চাঁদের মতো জল, মিথ্যা মনের ছল
মুখোশ-মানুষ পাই।

জলের মাঝে ঢেউ, কাঁদছে বুঝি কেউ ?
নরম নাকি মন ?
অনভ্যাসের ফোঁটা, শুনতে হবেই খোঁটা
অন্যায় আয়োজন।

মাধবীলতা দোলে, বাতাসে সুর তোলে
সুগন্ধে ভরপুর
সন্ধ্যাবেলার ফুল, উদাস নদীর কূল
মানবতা বহুদূর।
দূরের কাছে তারা, স্বার্থ নিয়ে যারা
স্বজনপোষণ করে
ছায়াপথ বড় একা, বিবেকের নেই দেখা
নীরবে অশ্রু ঝরে।

## সাধারণ মেয়ের ভালোবাসা * অমিত কুমার গোস্বামী

চাল ধোয়া জলের সাথে কতবার ভেসে গেছে
গতরাতের অভিমানের খুদকুঁড়ো।
ভাতের ফ্যানের মতো ফোঁটা ফোঁটা করে
অভাবী চোখের জল টপ টপ করে পড়েছে।
সেও হারিয়ে যাবে বলেই।
তবুও প্রতি রাতে গলায় আটকে থাকা ভাতের ড্যালার মতো
আবার নবজন্মে ভুমিষ্ঠা হই।
ডোবার জলের কলমী সেদ্ধ করে সকালের সূর্যকে মানত করি।
আজ রাতে যেন আরেকটু বেশী ভালোবাসতে পারি।

## এই দৈর্ঘ্যহীন গ্রীবা * লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল

কখনো নীরব কথা উড়তে উড়তে আকাশ হয়ে যায় – জলে তখনও
ভেজা পানকৌড়িটি নিজস্ব দুঃখের দীর্ঘ পথে – রোদের ঢেউ অনুসরণ
করে ভাসতে থাকে জলেই, মেঘ জানে ভাসমান অতীত টুকুই বিরামহীন
সান্ত্বনা, কিভাবে মরতে হয় শিখে নিতে নিতে নিজের
গোড়ালিতে তাকিয়ে
থাকে সমস্ত অজড়

হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে নিশ্বাস নিচ্ছি বেশ –
এই দৈর্ঘ্যহীন গ্রীবা আর হাপিত্যেশ করা তামাম বর্ণচ্ছটায় ক্রমশ
অনিয়ন্ত্রিত ধোঁয়া, ঠাণ্ডা গরমে নাকের জল গড়িয়ে পড়ছে স্যাঁতস্যাঁতে
অসুখে

অথচ মাথার উপরে গুচ্ছ গুচ্ছ জলফড়িং খুঁজে বেড়ায় নদী ও ঈশ্বরের
সঙ্গমস্থল

## চন্দ্রমুখী * ইন্দ্রজিৎ মিস্ত্রী

কী সুন্দর চাঁদপানা মুখ !
সবাই বলল ঘর আলো করবে
অথচ কলঙ্ক ছড়িয়ে চলে গেল

তবু, দরজা সবসময় খোলা
প্রতি রাতে জোনাকিরা ঘরে ঢোকে
আমি ভাবি চন্দ্রমুখী এলো বুঝি

**সময়কথা * ডাঃ সুশর্মা**

সময়কে নিয়ে অনেক ভেবেছি....
ভেবেছি যত, তারও বেশি অবাক হয়েছি !
কে বলে সময় গেলে সময় আর ফিরে আসে না ?
যতবার সময়কে হারিয়েছি...
ততবারই সময়কে ফিরে পেয়েছি পূর্ণ গতিতে !
ফিরে পেয়েছি যে সময়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছে ,
চেয়েছে নিঃশেষ করতে সবটুকু !
ঠিক ততখানিই গুড়িয়ে যেতে দেখেছি পাল্টা সময়ে...
ততখানিই ধ্বংস দেখেছি পাল্টা সময়ে !
দেখতে দেখতে বুড়ো হচ্ছি, সময় বদলাচ্ছে....
তবুও কিছু ভাবনা, চিন্তারা এখনও ওৎ পেতে বসে আছে
এখনও বসে আছে সময়কে নিয়ে ডিগবাজি খেতেই !

একদিন সময়ও ডিগবাজি খাবে তেমনি করেই...
খুব দূরে নয়, ওৎ পেতে বসে আছে সময়ও !
ঠিক ফুরোবে রাত, আঁধার মুছে আলো ফুটবে,
সময় ফিরে আসবে ঠিক সময়ের হাত ধরেই আগের মতোই।

**চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ফাইনাল -২০২৫**
**প্রদোষ কান্তি সিংহরায়**

রোহিত ভাইয়ের ব্যাটেতে, ভাই
উঠল রানের বান
ছক্কা চারে "কিউই ডিফেন্স"
হল যে খান খান ।

"হিটম্যান" আজ নির্বিচারে
"হিট" করে যায় শুধু
"কিউই বোলার" হয় বেসামাল,
সামনে মরুর ধূ ধূ ।

"চ্যাম্পিয়নস" কাপের লড়াই
উত্তেজনায় ভরা
নতুন রূপে আসল রোহিত,
কাটল রানের খরা ।

এই ভারতের "টিম ইলেভেন"
গড়া লোহার ভিতে
প্রমাণ হল সব খেলাতেই
অনায়াসে জিতে ।

লড়াই করে জিতল ভারত,
পেল নতুন কাপ
সব ধরনের "ক্রিকেটে" আজ
ভারত বাপের বাপ।

## নগ্নতার ঘা * মুহা. আকমাল হোসেন

কি করে ট্রয়ে এত বড় ঘা হলো
সে কথা গ্রীক আর হেলেন ভালো জানতো।

ক্ষমতার লবণ স্বাদ কত নগ্ন
সে কথা ক্লিওপেট্রার প্রেমপত্রে কিংবা
সন্ধির শর্তে প্রকাশ্য প্রথম লাইন

কত গোপিনী নগ্ন হলো যমুনার ডুব-জলে
সে কথা থাক লীলার আড়ালে,
আমাদের সব বস্ত্র চুরি হয়ে গেছে

কারা খুলে নিলো শাড়ি, সভ্যতার দ্রৌপদীর

আর্কিমিডিসের নগ্ন ভেজা শরীর দরবারী উল্লাস
ছুঁয়েছিল জ্যামিতিক জীবনের বৃত্ত অতিভুজ

আমরা নগ্ন হতে হতে শূন্য দশমিক শূন্য
আমরা নগ্ন হতে হতে অসংগত
আমরা নগ্ন হতে হতে টলস্টয়ের ‘দ্যা ন্যাকেড কিং’ !

## মৌমাছি দল * অলোক কুমার প্রামাণিক

যেই সরেছে বর্ষা
দিগন্ত ওই ফর্সা
গুনগুনিয়ে মৌমাছি দল
জমিয়ে দিল জলসা।

আকাশ হতেই চুপ
ফুল ফুটেছে খুব
সদ্য ফুটে শাপলা শালুক
দেখায় এবার রূপ।

মৌমাছিদের দল
গাইছে অনর্গল
সময় হলো চয়ন কালের
বলছে এবার চল।

ঘুরিয়ে বোঁচা নাক
ভরছে মধুর চাক
তাইনা দেখে ভ্রমর অলির
লাগলো এবার তাক।

## আমাদের গ্রাম * কার্ত্তিক মণ্ডল

আমাদের গ্রামখানি সবুজে মোড়া
মাঝখানে ছোটো নদী, ভাঙা সেতু জোড়া ।
পার হয় সারাদিন লোকজন তাতে
আঁধারে নীরব দুখি পড়ে থাকে রাতে ।
দুই পাড়ে ঝাউবন সার সার তাল
হিজল বকুল কাশ দোলে তমাল।
কলকল স্রোতধারা  চরে বক হাঁস
তারই চরে থরে থরে আমাদের বাস।
আমগাছ জামগাছ বাঁশঝাড়ও আছে
হাওয়ার দোলায় সব মহাসুখে নাচে।
তারই জলে কোলাহলে করি সব স্নান
জালিরাও ফেলে জাল গেয়ে হাসি গান।
সকালে সূর্য হাসে, পূব দিক রাঙা
তারই রঙে আঁকা যত জলাভূমি ডাঙা।
মিলেমিশে ধরি হাত পাঠশালে যাই
পড়ি খেলি এক সাথে হাসি নাচি খাই।
পাকা ধান দোলে মাথা সারা মাঠ জুড়ে
কিচিমিচি পাখি গায় পাখা মেলে উড়ে।
মায়ের সমান গ্রাম ভুলতে না পারি
সুখে দুখে থাকি সব ছায়াতলে তারই।

## শব * পার্থ মুখার্জী

জমাট-বাঁধা ইচ্ছেরা হিসেবের অন্তর্জাল-এ
কখন যে ইন্টারলক হয়ে যায় ডাল-ভাতের আড়াল-এ
কার দিকে ঝোল, কার দিকে আলু
অফিস ফেরত শরীর হেডফোনে ভুলে থাকে।

সম্পর্ক-এর মুখ - মুখোশে ভক্ত উধাও,
ভক্তের ভিড়ে বাতাসা লুট, হরি কবে পায় ?
মিছিলে খুঁজছে যারা হারিয়ে যাওয়া অধিকার,
ভাবের ঘরে সিঁদ কেটে আর কতদিন উল্লাস ।

শরীর যদি ভাঙে ভাঙুক, তবুও মুঠো শক্ত হবে,
আমার বুকের রক্তে লেখা আছে তোমাদের নাম
আজ না হয়, কাল হিসেব বুঝে নিতে আসব ফিরে...
হাতের তালুতে মৃত্যু নাচে, অপেক্ষা সময়ের।

## জাতিদ্বেষ # শুভদীপ মাইতি

বৃষ্টি কণায় ইতস্তত উথলে উঠছে পাড়।
পাশেই চকমকি-পাথর ঠুকছে সহজ-সরল কাকমারা, মাটির
নিকটে

আমি এই ধর্মের গায়ে শূন্য এঁকে তফাৎ যাচ্ছি।
পাথরকথায় পাল্টে যাচ্ছে খোল নোলচে, ছুঁয়ে দেখা
ক্যালামাইন  ত্বক

**খোলা চিঠি * রবিন কুমার দাস**

দুর্গা এবার চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিল ডাকে
শর্ত দিল খিচুড়ি ভোগ দেয়না যেন তাকে !
বিরিয়ানি, পোলাও চিকেন, কাবাব রকমারি
ভেটকি ভাপা, দই কাতলার স্বাদ যেন পাই তারই।

গলদা চিংড়ির মালাইকারি দু-দশ পিস চাই
ডাব-চিংড়ি আর পাতুরি দু'বেলা রোজ পাই !
সর্ষে ইলিশ, ইলিশ ভাপা পাতে যেন পড়ে
এসব যেন নামী দামী সেফ তৈরি করে।

ভোগের নামে ডাল ভাত আর রোচে নাকো মুখে
কলকাতার ওই নামী খাবার খেয়েই কাটাই সুখে,
খিচুড়িটা থাক তোলা থাক, চাইনা ভাজাভুজি
হালফ্যাশনের আমিষ রান্না ভোগের থালা খুঁজি।

গণশা, কেতো ভোজন রসিক, আমিই বা কম কিসে
নানান রকম স্বাদ পেয়েছি ওদের সাথে মিশে,
হ্যাংলা পেটুক সরস্বতী, লক্ষীও ঠিক তাই
বিকেল হলে এগরোল আর ফুচকা ওদের চাই !

দুর্গা বলে, ইচ্ছে করে ঘুমের আগে রাতে
এই ক'টা দিন কোলড্রিংকসটা পাই যেন রোজ হাতে,
খাওয়া শেষে মুখশুদ্ধির চাই যে একটা পান
চিবিয়ে চিবিয়ে ছড়িয়ে দেব জর্দার আঘ্রাণ।

**নির্জনতা * কল্যাণী মণ্ডল**

বেশ তো রয়েছি নির্জন নিরালায় একাকী
সূর্যের গনগনে উত্তাপে পুড়িয়ে নিই নিজেকে।
দু'চোখ জুড়ে ভীড় করে ছোট্ট একফালি বারন্দা,
পুরোনো নাম ধরে এখনো কারা যেন ডেকে যায়
বিকেলে হাতছানি দেয় মেঠোপথ।
স্বচ্ছ জলরঙের ছবি ভেসে ওঠে চোখের পাতায়
পর্ণমোচী কবিতায় ঠাসা ডাইরির পাতায়
অসীমের ওপারে বাসা বাঁধে নতুন স্বপ্নের দেশ
আকাঙ্খারা সব মৃতপ্রায় মনের ভিতরে
আমি মরা গাছ হয়ে বেঁচে থাকি
নির্জন দুপুরে নিজের প্রতিবিম্বের সাথে একাত্ম হয়ে যায়।
অস্পষ্ট কিছু কথা হারিয়ে যায় ব্যাকুল ঘূর্ণিঝড়ে
রাতের অন্ধকারে তখন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে কিছু অনুভূতি
বৃষ্টি নামায় অকাল বর্ষণে নিস্তব্ধ আঁধার রাতে।

**বিলাপ * অনন্যা চক্রবর্তী**

অংশু হাসিছে
অংশু কাঁদিছে
অংশু করিছে খেলা...
মেঘমল্লার উঠিছে বাজিয়া
অংশু ভাসিছে ভেলা !
কাম্যা নিভৃতে কালকূট সেবনে
ভূতলে পড়িল ঝ'রে,
করুণ জলধি মরিচা শবাধার
অশুভ ইঙ্গিতে !
মেদিনী ঢাকিছে অভ্রে আজি
অংশু আঁধার পাড়ে,
তিমিরে ডুবিল অনুরাগ ছোঁয়া
ফিরাব কী উপায়ে !!
কাম্য প্রতিবিম্ব বিভ্রম সরণিতে
স্মৃতিতে শূন্যতা আঁকে,
আঁখিপাতে নীরদ সম্বল করি
ত্রাসিত কাম্যা বিলাপে।
"বনমালী তুমি পর-জনমে হইয়ো রাধা"

**সহ্য * শাশ্বতী বসাক**

বিস্মৃতির ওপর থেকে ভেসে আসে মেঘ, সাথে আনে মেঘদূত
আর কিছু হারিয়ে যাওয়া মুহূর্ত, ঝিরঝিরে বৃষ্টিপাতের সাথে মিশে যায়
জঙধরা এক সাইকেলের ঘন্টাধ্বনি, মুহূর্তে তা বাঁশরির থেকেও
কর্ণকুহরে আরামপ্রদ বোধ হয়, চেতনারা ঘুমিয়ে পড়তে চায়
একটি অদৃশ্য হাতের নিবিড় স্পর্শে, সেই স্পর্শ আত্মিক নাকি অন্তিম
সে ভাবনায় ভোর হয়ে আসে নিয়মমাফিক, বালিকাটি ক্রমশ
ভুলে যেতে থাকে 'বিচ্ছুরণ' শব্দটি, সে ক্রমে নারী হয়, আজ প্রৌঢ়তার
সীমায় গিয়ে খোঁজে সীমারেখা তার। এই নিহিতকাল অতলে তলিয়ে
যেতে যেতে জলের উপরে উঠে শ্বাস নেয়, ভাবে, হারানো আর
প্রাপ্তির মধ্যে ব্যবধান না থাকলে জীবন অনন্তকে ছুঁতে পারে না।

**এসো, ভালোবাসা মাখি * শুভাশিস সরকার**

নাবালিকা শিষ কত কথা বলে যায়,
তুমি কি শুনছো ? সে সময়ই কোথায় ?

বৃষ্টির শিলালিপি রেখে যায় ছাপ
মেঘেরা গলছে, বেড়ে গেছে উত্তাপ।

চড়া তাপ আর হিমঘর পাশাপাশি
গোপন চুমুতে করে ভালোবাসাবাসি।

সঞ্চয়ে রাখা মিঠে রোদ্দুর শীতে -
তোমাকেই যদি ছুঁয়ে দি আচম্বিতে !

খেঁজুরের গাছে কাকভোর রসে নেশা -
সে রসেই হোক আদরের মেলামেশা।

## ভেলা * অভিজিৎ বিশ্বাস

ভীত বিশ্বকর্মা তো জানত সেই গোপন ছিদ্রপথের কথা
নিজহাতে রচেছিল বাসরসজ্জা, এমন করেই
কালনাগিনীরা যুগ হতে যুগান্তরে সেজে ওঠে ভাড়াটে
সৈন্যের সাজে, দংশায় লখীন্দরের প্রাণ।
গাঙুরের জলে যতই ভাসুক বেহুলা সতীর মান্দাস
কামুক যত দৃষ্টির সম্মুখে শরীরী বিভঙ্গের যত
অনুপুঙ্খ মুদ্রায়, হাস্যে ও লাস্যের চুলচেরা বিশ্লেষণে
অর্জিত হয় মৃত স্বামীর প্রাণ, এইভাবেই যুগে যুগে
কালে কালে গর্ভজল ভেঙে তুষ্ট হন ক্ষমতাশালী দেবতারা,
নির্ধারিত বিনিময়মূল্যে পূজা দেয় অসহায় চাঁদ,
শোকাতুর চম্পকনগর পুনরায় মেতে ওঠে উৎসবে।

## ঢেকুর * আভা সরকার মণ্ডল

আমাদের বুক অবধি নদী
হৃদয়ে জেগে ওঠা উজানের চর
আমাদের গলা বেয়ে উঠে যায় সুগন্ধি কারুকাজ
আমরা হাওয়ায়  ভাসাই লতানো ঢেকুর !

আমাদের মগজের কোষে ঘুমায় আলোময় বিটপ
তলায় তার প্রচ্ছন্ন আঁধার
আমাদের চারদিকে অতলান্ত প্রেম
আমরা তারা গুনে গুনে রাত্রি করি পার !

## মাতৃভূমি * প্রমতম সী

রাজপথ জুড়ে হাঁটছে লক্ষ ভাই
কাঁধে নিয়ে তারা নিথর লাশের দেহ,
বুলেটে ওদের ঝাঁঝরা হয়েছে বুক
সোনার মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে কেহ।

কোলহারা মা'র আজ নেই চোখে জল
পাশে ভাইবোন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে,
বোবাকান্নার ছবি ভেসে ওঠে গানে
রাজপথ আজ দু'চোখেই জল বাঁধে।

আকাশের বুকে চেয়ে আছে অগনিত
একটা স্বাধীন একটা স্বপ্নভূমি,
হাতে আঁকা তার বিজয়রথের ছবি
রক্তাক্ত বুক আগলে মাতৃভূমি।

অনেক ঝরেছে অনেক অশ্রুজল
আর নয় আর রক্ত ভেজা মাটি,
আমরা গড়ব নতুন স্বপ্ন দেশ
আগামীর শিশু পাকনা একটু খাঁটি।

**আমি জানকী নই * কৃতিকণা চিনি**

শ্রীচরণেষু,

আমি সীরধ্বজ কন্যা। চিনতে পারলেন না তো ? খুড়ার নাম কুশধ্বজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি, এবারে চিনতে পেরেছেন। জনক-দুহিতা বললে হয়তো আপনার চিনতে সুবিধা হত। আসলে বিদেহ রাজ্যের সকল শাসকদেরই বলা হত 'জনক'। এটি হল মিথিলার রাজাদের কৌলিক উপাধি। কিন্তু রামায়ণের দৌলতে এবং জানকীর পিতা হওয়ার সুবাদে, ইতিহাস পিতাকেই 'জনক' নামে চিহ্নিত করল। রাজা হয়েও, পিতা ছিলেন বস্তুগত সম্পদের প্রতি অ-আসক্তির একটি আদর্শ উদাহরণ। জীবন ছিল অনাড়ম্বর, অনাবিল।

খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী, নাবালিকা আমি, দিদির হাত ধরে এলাম শ্বশুরালয়ে। সাথে এল খুড়ার দুই কন্যাও। পিতৃগৃহের তুলনায় এখানে ঘটা খানিক বেশি। পরিজনদের ঠাটবাটও আলাদা। সর্বোপরি, লোকের মন পেতে কাঠখড় পোড়াতে হয় বেশ। দিদির বুকের ভিতর লুকিয়ে থাকতাম। তবে, ভিড়ের মাঝে আপনাকে চিনে নিতে বেশি সময় লাগেনি আমার। এক পিক-ধ্বনি মাখা ভোরে আবিষ্কার করলাম, মিষ্টভাষী মানুষটার প্রেমে পড়ে বুক ভেঙেছি। আর ঠিক তারপরই, কপাল ভাঙলো। জানি, ভক্তের গতি ভগবানের পশ্চাতেই, তবু এও তো ঠিক যে, ঘর পুড়লো আমার ! ভগবান আর ভগবতীর পিছে আপনিও চললেন বনবাসে। শত অনুনয়েও এ-টুকু বুঝলেন না যে, আমিও আপনার পরম ভক্ত। তাই, আমার গতিও আপনার পশ্চাতেই হওয়া উচিত।

আপনার বনবাস চলাকালীন রাজপ্রাসাদের এতটুকু সুখ ভোগ করিনি। সুদীর্ঘ ১৪ বছর ব্রহ্মচারিণী হয়ে খড়ের শয্যায় শুয়েছি, ফলাহার করেছি। লঙ্কায় যুদ্ধের সময় শুধু আমার তপস্যাবলে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেকথা আপনার অজানা নয়। আমার ত্যাগ আপনার মহত্বকে ক্ষুন্ন করতে পারে, সেই ভয়েই ইতিহাস আমাকে পার্শ্বচরিত্র করে রেখে দিল, আপনার পাশটিতে ঠাঁই জুটলো না।

পরে অবশ্য অঙ্গদ ও ধর্মকেতুর মা...তবু কিছু প্রশ্ন মনের মধ্যে ঘুরপাক খায় আজও। প্রেম এবং কর্তব্য কি পরস্পরবিরোধী ? নির্জন বনবাসী রাতে, প্রেম কি কখনও ভক্তির মুখোমুখি এসে জবাবদিহি করেনি ?

শতকোটি প্রণাম রাখলাম। জয় হোক ভক্তের।

ইতি -

শুধু আপনারই পরম ভক্ত

ঊর্মিলা

## প্রতিবাদ * মন্দিরা মুখার্জী ব্যানার্জী

আজ আমাদের হারিয়েছি মান
হারিয়ে ফেলেছি সম্বিত,
কালে কালে আমরা ধ্বংস করেছি
সোনার বাংলার ভিত।
আর প্রতিবাদ নয়, নয় প্রতিরোধ
এবার দু'হাতে ধরো তরবারি,
তুমি দেবী চৌধুরানী, মাতঙ্গিনী, প্রীতিলতা,
হে বাংলার নারী !
শত আঘাতেও ভাঙছে না ঘুম
আর সইবে কত অত্যাচার,
দিনের পর দিন চলছে দেশে
বাক্যবিহীন অনাচার !
মুখ দেখানো যায় না কোথাও
ভিনদেশে কোথাও গেলে, বাঙালির শিরদাঁড়াটা ভেঙে গেছে
কানের পাশে এসে বলে !
প্রতিবাদে তুমি, পাবে না তো ন্যায়
চাই চাবুকের জাগরণ,
সিংহ তুমি, আজ সারমেয় কেন
চাই বজ্রের আস্ফালন।

## জীর্ণ পৃথিবী * মন সাহা রায়

মা মাগো, শুনছো কি তুমি ?
আর দিও না আমায় জন্ম
এই পৃথিবীর বুকে,
যে কিনা নিজেই জরাজীর্ণ।
যেখানে সূর্যের আলো হেরে যায়,
আঁধারই একমাত্র কথা কয়।
বাবার বুকে নেই কোন আশ্রয়
দাদু, কাকা, জ্যাঠা, সবাই যেন কেমন,
আপন হয়েও অন্যরকম।
ফুলের গন্ধ হারিয়েছে প্রাণ
চারিদিকে শুধু রক্তমাংসের ঘ্রাণ।
আঁচড়ে কামড়ে মেটে না আশ
অবশেষে দিতে হয় শেষ নিঃশ্বাস।
কেন আনো এমন পৃথিবীতে ?
যেখানে কুঁড়িতেও ছাড়ে না প্রাণ নিতে।
রূপেই শুধু মানুষ ওরা
ভেতরে পশুর বাস
কবে আসবে দুর্গা আবার ?
করবে অসুর নাশ !

**খঞ্জনার আলোর ঘুঙুরে * অসীম দাস**

যতদিন স্মৃতির শরীর ঘিরে, শোকগন্ধ আঁকবে আলপনা
ততদিন তোমার যাওয়া অলীক কল্পনা।
গাঙুর গোধূলি ছায়া, ইন্দ্র - আঁধার ফুঁড়ে
ভোরের দুপুরে ফের ফিরে আসবে খঞ্জনার আলোর ঘুঙুরে।

আশার অসীম যাত্রাপথ পেরোনো সহজ নয় জেনে
মন্থর আফশোস লাগাতার হালকা করবে
জীবনের ভার কিছু, না-পাওয়ার লাগামকে টেনে।

জাতক তোমাকে স্বপ্নের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগাবে।
অশৌচ আতপ স্বাদ সময়ের জিভ এসে চেটেপুটে নিলে
নাভির তীর্থ জলাশয়ে এসে আটকে থাকবে আবহমান ।

উত্তর-জাতকের পূর্ণ বিস্মরণ ছাড়া
হে পূর্ব-জাতক, তোমার মৃত্যু নেই !

**রেবন্তিকা * রেবা মুখার্জি**

খোলা আকাশের নিচে
তুমি বসে আছো কার অপেক্ষায় ?
শীতের ঠান্ডায় মাথা ব্যাথা
গা-বমি কাঁপুনি শরীরের
জ্বালা-যন্ত্রণায়,
রেবন্তিকা, তুমি ফিরে যাও
আর এসো না এই অপেক্ষার
প্রহর গণনায়,
যা পেয়েছো তার কিছুটা
ফেলে দাও তোমার স্মৃতির
বিস্মৃতির পাতায়
অবশেষে অবহেলায়।

**বর্ষণমুখর * শ্রাবণী ঘোষ**

ঘুম ঘুম নির্জন
নীরব এ ঘর,
ঘোর-ঘোর বর্ষায়
দাপুটে প্রহর।

শনশন অবিরাম
বাতাস সরব,
ঝর ঝর বৃষ্টিতে
শুধু জলরব।

কনকনে কাঁপুনিতে
পোষ্য দু'খান
জবজবে ভিজে তারা
গুটিয়ে দু'কান।

হিলহিলে বিছে চলে
দুপাশে দু'শুঁড়
ঘিনঘিনে অনুভূতি
মনে ভরপুর।

যাও যাও বর্ষা
এখুনি চলে,
উঠুক সে রবিমামা
রৌদ্রে জ্বলে।

**রোমাঞ্চ শিরায় জমছে বিষাদ * মানস মান্না**

অলি-আহ্লাদ নিয়ে ছুটে যাই ফুলে
বিষাদ ঝাঁপিতে ভরে ফিরি বারবার।
কাঁটার প্রাচীর ঘিরে কি যাদু মেখে
দৃশ্যে ভরিয়ে রাখো টানের বাহার !

অসুখ-সাঁতার কাটি জ্যোৎস্নায় মেখে
অধরা রইলে দূর আকাশের চাঁদ।
অতলে পায় না তল মনের ডুবুরি
রোমাঞ্চ শিরায় শুধু জমছে বিষাদ।

দূর চূড়া বনানীতে মন যায় ভেসে
পাই না নাগালে স্বাদু বনানীর শ্বাস।
ভরিয়ে রেখেছো পথ চড়াই ও খাদে
কেমনে মেটাবো বলো মনের এ আশ ?

আসলেই খাপে ভরা ভীতু তরবারি
সমুখ সমরে বের করতেই ভয়।
হাতে হাত রেখে বলি, রোমাঞ্চ রোমে
সাহস, ভয়ের কাঁধে নাজেহাল হয়।



**ইচ্ছের ভেজা ঘামে**
**পারমিতা রাহা হালদার (বিজয়া)**

তোমার জন্যে লিখে রাখা সব চিঠি
মেঘ-পিয়নের ব্যাগের ভিতর ব্যাকুল,
সপসপে ভেজা ঘামে মোড়া ইচ্ছেগুলো
জীবন ভাঙা স্রোতের মতন আকুল... !

রোদের 'মেল'-এ মন খারাপের খবর
পাকদন্ডী পেরিয়ে মেঘ-পিয়নের পাড়া,
কুয়াশায় ঘেরা এলোমেলো যা কিছু
বৃষ্টিরাও বারে বারে এসে দেয় সাড়া... !

আমার চোখে স্বপ্ন ভাঙার যত ঢেউ
কুলকুল নদী হয়ে বইছে বারোমাস,
বুকের ভিতর কেবলই দুরন্ত ঘূর্ণিপাক
বেআব্রু পাঁজরে আঘাতের নিঃশ্বাস... !

আমার মনখারাপ জুড়ে রোদ একফালি
আশায় আশায় বসে তারই অপেক্ষায়,
আলো ভেবে যে আগুনে দিয়েছি ঝাঁপ
দুঃখ-সুখের সেই গল্পটাই চিঠির পাতায়... !

## আমি কারিগর * সুস্নিগ্ধা রায় চৌধুরী (মাম্পি )

আমি শিল্পী, করি সৃষ্টি শিল্পসম্ভার।
যুগে যুগে আমি আসি শ্রমিক হিসেবে ।
আমি কারিগর, সৃষ্টি করি শিল্প।
কলকারখানা আমার জন্য তৈরী।
তৈরী করি রকমারি সব সম্ভাবনা।
আজ থেকে শুরু করে যুগে যুগে
আমাকে নিয়ে তৈরী হয় একাধিক শিল্পাঞ্চল।
বর্তমানে এই ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবীতে আমার কদর
আস্তে আস্তে কমছে। আমি এখন বেকার, কাজ নেই
শিল্প নেই, তাই নেই সম্ভার। এখন সব কিছু অনলাইনে,
তাই আমার আর দরকার নেই।
কম্পিউটার দশজনের কাজ করে একজনে।
তাই আস্তে আস্তে আমি নি:শেষ।
অনেক শিল্প আজ বন্ধ,
তাই দরকার কমেছে আমার।
আমি ঠায় শপিং-মলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করি রকমারি পসার বিক্রি।
আমার সংসার চালানো কঠিন, সরকার উদাসীন,
সুরাহা হবে না কোনোদিন
আমি আজ শেষ বিশ্বকর্মার বরপুত্র ।
আমরাও শেষ শিল্পও শেষ।

## অপূর্ণ সুখ * সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

অরুণ বরণ সকাল বুঝি সোনায় ঢালা,
অপূর্ণ সুখ দেয় উড়িয়ে কিরণমালা !

পূণ্যিপুকুর মধ্য দুপুর শান্তি মায়া,
দগ্ধ ক্ষত হিসাবখাতায় রিক্ত ছায়া !

শেষ বিকেলে পথের ধুলো কই গোধূলি ?
পাথর শহর বুঝবে কি আর কাব্যবুলি !

মন্দ্রমলিন রাত্রিকালীন পালক খসা-
অভিমানীর কাব্য যাপন সর্বনাশা !

হেমন্ত শ্বাস নেই অবকাশ  জোরসে টানো,
মনফকিরা পান্থ নিবাস থাকবে জেনো !

চরৈবেতি মন্ত্রে চলা  নেই তো থামা,
জোয়ার-ভাঁটায় খতিয়ানের খোয়াবনামা !

তৃষিত হৃদয় তাসের ঘরে শক্ত ভিতে,
মোহনচূড়ার নরম ঠোঁটে ফেলবে জিতে !

তিতলি-ডানায় অগুন্তি সব রং যে ঢালা,
অপূর্ণ সুখ দেয় উড়িয়ে কিরণমালা !

**বিলম্বিত সময় * অতসী চক্রবর্তী ঠাকুর**

জটিল সময়ে বিশ্বাসটুকু গাঢ় থাক।

কখনো কখনো একাকিত্ব নিজেকে গুছিয়ে নিতে সাহায্য করে। প্রতিনিয়ত উদ্বেগ আর অনিশ্চিত ক্লান্ত সময় বিলম্বিত করে জীবনের গল্প। গভীর অসুখ নিয়ে আসে। শুশ্রূষা একটাই, নিজেকে শক্ত রাখা।

কিছু কথা মধু ছড়ায়, আবার কিছু কথা মধু শুষে নেয়। জৌলুষহীন দিনে আরো বেশি করে লিখি জীবনের গল্প। জীবন তখন মাথা নত করে আমার কাছে। যেটুকু অভিমান ছিলো, ধুয়ে ফেলেছি চোখের জলে। এখন শুধু তোমায় নিয়ে স্বপ্ন দেখি। সামনে লম্বা পথ। জীবন একটু একটু করে জেগে উঠছে আনন্দে। ভালোবাসার সৃজনে মিশে আছো তুমি।

একঘেয়ে ভাবনা কবিতাকে পৌঁছে দেয় শূন্যতায়। আমি পথ বদলে দি...কষ্টের পথে আঙুল ছোঁয়াই। গোলাপি মিষ্টি ইচ্ছেগুলো নিয়ে অক্ষরের বুননে শব্দের মালা গাঁথি। নক্ষত্রের আগাম বার্তায় ভালোবাসাকে সতেজ করি।

তোমার বেগুনি ডানায় যে স্বপ্ন ভর করে আছে, আমি তাকে আকাশজোড়া সূর্যের হাসিতে রাঙাতে চাই...

**বর্ষা দিনের কথা * ডালিয়া মজুমদার রায়**

হঠাৎই স্মৃতিতে ভেসে আসে আমার মায়ের মুখ
কবিতা লিখতে গিয়ে খুঁজে পেলাম, ছোটবেলার হাঁটুজলে ভেজা সুখ।

দূর থেকে দেখতাম সাইকেলে ফিরে আসছে বাবা
দরজা খুলতেই জাপটে ধরতো, সকাল থেকে জমানো সুখ।

মায়ের নামে দরজা খুলতেই আসতো মাছের গন্ধ !
গন্ধরাজ লেবুর সাথে রুপোলি ইলিশের সঙ্গত জমত !

ইস্কুলে যাওয়ার মহা ধুম পড়তো এরপর,
বাসনগুলো লাগিয়ে দিত যুদ্ধ পরস্পর।

বিকেল পেরিয়ে পেটকাটা মূর্ধন্য"ষ"এর মত বিষন্ন বাড়ি ফেরা !
ঘটতো এসব কোন এক বর্ষা দিনে বাদলপিছু
বিকেলবেলা।

এক বাক্স গল্প করে সন্ধ্যে হতেই বই খাতা !
গুপ্ত বিয়োগান্ত দীর্ঘশ্বাসে, মনে পড়ে কত কথা,
এই বর্ষা বিকেলবেলা।

**বিশ্বস্ত প্রতিবেশী * ফটিক চৌধুরী**

কেউ জানে না সকালটা যেভাবে গেল
বিকেলটাও সেইভাবে যাবে
কেউ জানে না।

নির্জন দ্বীপে দাঁড়িয়ে আমরা
সুনামির ছোবল, নাকি
মায়াবী নৌকো এসে নিয়ে যাবে
কেউ জানে না।

শুধু জানি যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ,
আরও জানি, পাহাড় নদী অরণ্য
আমাদের বিশ্বস্ত প্রতিবেশী।

# গ ল্প মা লা ১

---

**এক আকাশ আশ্রয় *  চৈতন্য দাশ**

চারদিকে গোলাগুলির শব্দ। থেকে থেকে জানলার কাচ কেঁপে কেঁপে উঠছে। ছোট্ট তানিয়ার চোখে আতঙ্ক জমে ওঠে। মা অলকাদেবী হাতজোড় করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছেন—"ঈশ্বর, আমাদের রক্ষা করো।"

তাদের এক্স দেশটা একসময় ছিল সুখের ঠিকানা। ছোট শহরের এক ছোট্ট বাড়িতে হাসিখুশিতে কাটত দিন। তানিয়ার বাবা যতীন সেন ছিলেন স্কুলশিক্ষক। তানিয়া আর তার ভাই সমীর স্কুলে যেত। বিকেলে খেলে বেড়াত। ডালভাত খেয়েও হাসিখুশি সুখের জীবন।

কিন্তু হঠাৎ শুরু হলো ওয়াই দেশের সঙ্গে যুদ্ধ। একদিন সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে বোমার শব্দ। তারপর আরও বিস্ফোরণ, রক্ত, ধোঁয়া....

শহরটা বদলে গেল যুদ্ধক্ষেত্রে। নিরাপদ আশ্রয় বলতে কিছু রইল না।

তিনটে রাত পেরোতেই যতীনবাবু সিদ্ধান্ত নিলেন, আর দেশে থাকা যাবে না ! থাকলে মরতে হবে। স্ত্রীকে বললেন, "চলো, দেশ ছাড়ি। কোথাও শান্তি খুঁজি।"

পরিবার নিয়ে রাতের আঁধারে ঘর ছাড়লেন। সঙ্গে সামান্য কিছু কাপড় আর কিছু টাকা। পথে পথে সেনাদের চেকপোস্ট। কাঁটাতারের বেড়া। গুলির শব্দ। তানিয়া, সমীর হাঁটতে হাঁটতে কাঁদে। তাদের ছোট্ট ছোট্ট পায়ে কাঁটা বিঁধে যায়, কিন্তু থেমে থাকা মানেই মৃত্যু।

তারা প্রথমে পৌঁছায় জেড দেশের সীমান্তে। কষ্টেসৃষ্টে পার হয়ে যায়। কিন্তু কোথাও স্থায়ী আশ্রয় নেই। শরণার্থী শিবিরে ঠাঁই মেলে, তবে সেখানে জল নেই, বিদ্যুৎ নেই, যথেষ্ট খাবার নেই ! শীতের রাতে প্লাস্টিকের তাঁবুতে কম্বলের অভাবে তানিয়া আর সমীর একে অপরকে জড়িয়ে ধরে...

দিন যায়, মাস যায়। যতীনবাবু কাজ খুঁজে পান না। শহরের মানুষ শরণার্থীদের ভালো চোখে দেখে না। কাজের খোঁজে গেলে কেউ কেউ তাড়িয়ে দেয়। বলে— "তোমাদের জন্যই তো আমাদের দেশে এত আকাল।"

অলকা সেন চুপচাপ চোখের জল ফেলেন। সে একদিন ছিল সম্মানিত পরিবারের বউ। আজ তাকেই খাবারের প্যাকেটের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয় !

তানিয়া প্রতিদিন জিজ্ঞেস করে, "আমরা কবে বাড়ি ফিরব মা ?"

মা কিছু বলার ভাষা খুঁজে পান না! কী বলবেন ? যুদ্ধ থামবে না। ঘরভাঙা শহরে আর ফেরা যাবে না।

একদিন সমীর খেলতে গিয়ে আহত হয়। মাঠে খেলার সময় কাছেই বিস্ফোরণ ঘটে। শরীরে ছিটকে আসে ধাতব টুকরো। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায় না, কারণ শরণার্থীদের চিকিৎসায় চরম অবহেলা। শরণার্থী দেখলেই হাসপাতালের কর্মীরা দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয় !

যতীনবাবু রক্তমাখা ছেলেকে কোলে নিয়ে শুধু বলেছিলেন, "ঘর ছেড়ে এসে চরম ভুল করেছি। কোথাও তো আশ্রয় পেলাম না। আমার জন্যই ছেলেমেয়ের এই দুর্দশা !"

চিকিৎসার অভাবে সমীরের ক্ষততে সংক্রমণ দেখা দেয়। তিন দিন পর, নিঃশব্দে চোখ বন্ধ করে সে। শরণার্থী শিবিরের পেছনে একটা কাঁচা শ্মশানে দাহ করা হয়। তানিয়া তখনো বুঝতে পারে না, তার ভাইটা আর ফিরবে না !

এরপর থেকে যতীনবাবু কথা কম বলেন। একদিন অনেক ক্ষোভে-কষ্টে বলেন,

"আমরা এখন আর মানুষ নই, শুধু এক একটা সংখ্যা মাত্র। খবরের পাতায় লেখা— এক লক্ষ উদ্বাস্তু, হাজার জন মারা গেছে। আমাদের ব্যথা কেউ শুনে দেখে না !"

তানিয়া এখন বড় হচ্ছে। কিন্তু তার শৈশব মানে শুধুই কাঁটাতার, ঠাণ্ডা রাত, সঙ্গে অনিশ্চয়তা ! তার খাতায় আঁকা হয় বিস্ফোরণ, সেনাদের ছবি, মায়ের কান্না। খেলনার জায়গায় থাকে রিলিফের চিঁড়ে-রুটির প্যাকেট !

ধীরে ধীরে তারা জেড দেশেই স্থায়ীভাবে আশ্রয় পায়। কিন্তু সে এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, পরীক্ষা, যাচাই, সন্দেহ !

তবুও যতীনবাবু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেন, একদিন দেশে ফিরবেন... কিন্তু দেশে ফিরে যাওয়ার ভিসা আর কোনদিন পেলেন না...

নানান দুশ্চিন্তা অক্টোপাসের মতো চারদিক থেকে চেপে ধরে। এই দেশ থেকেও হয়তো তাড়া খেয়ে পুনরায় জন্মভিটের উদ্দেশ্যে তল্পিতল্পা গুটিয়ে ছুটতে হবে— এই আশঙ্কা প্রতিদিন তাড়া করে !

তানিয়া এখন অনেক বড় হয়েছে। সে জানে, ঘর মানে শুধু দেয়াল নয়। ঘর মানে নিরাপত্তা, সম্মান, স্থায়িত্ব, এক আকাশ আশ্রয়, যা তাদের নেই। যুদ্ধ কিংবা রাজনৈতিক সংকটে ঘরহারা হওয়া মানুষগুলো কেবল নিজের দেশ হারায় না, হারায় পরিচয়, মানবিক মর্যাদা, ভবিষ্যৎ। তবু তারা বাঁচে, কারণ বেঁচে থাকাটাই তাদের একমাত্র প্রতিবাদ।

**প্রত্যাবর্তন * বিদ্যুৎ মিশ্র**

সকাল থেকেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, আকাশটা যেন ফুটো হয়ে গেছে। জানলার থেকে বাইরের দিকে আনমনে তাকিয়ে আছেন সত্যসাধনবাবু। বাড়িতে তার বউ রান্নাঘরে ব্যস্ত। ছেলে কী যেন একটা কাজে বাইরে গেছে। এরকমই একটা বৃষ্টির দিনে ঘটে গেছিল একটা চরম বিপর্যয়। তারই খণ্ড স্মৃতি মনের মধ্যে তোলপাড় করে দিয়ে যাচ্ছে। ঠিক কি ঘটেছিল ঘটনাটা, সেটা একটু খুলেই বলি। সেদিনও এরকম দুর্যোগপূর্ণ দিন ছিল, অফিসের কাজে বাইরে বেরোতে হবে, তাই তিনি তাড়াহুড়ো করে তার স্কুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বৃষ্টির মধ্যে। বাড়িতে বলে গিয়েছিলেন জম্পেশ করে খিচুড়ি রান্না করতে। ফেরার পথে তিনি মাছ কিনে আনবেন আর, সেটা যেন ভালো করে ফ্রাই করে রান্না করা হয়। দুপুরের মধ্যে ফিরে এসে বাড়িতেই লাঞ্চ সারবেন তিনি।

রাস্তায় খুব একটা ভিড় ছিল না। কিন্তু, প্রবল বৃষ্টিতে বাইক চালানো খুবই অসুবিধা। তবু, যথাসম্ভব ধীরগতিতে তিনি সাবধানতার সাথে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটি স্কুলের বাচ্চা ছেলে ছুটে এসে তার স্কুটির সামনে পড়ে। তিনি তাকে বাঁচানোর জন্য সজোরে ব্রেক টিপে ধরেন, তবু স্কিড করে বাচ্চাটির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। এতে তিনি গুরুতর আহত হননি, কিন্তু বেশি ক্ষতি হয় বাচ্চাটির। বাচ্চাটিকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পরও, অতিরক্তকরণের জন্য শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচানো যায়নি।
ছেলেটির মা-বাবা থানায় কেস করেছিল। কিন্তু সত্যসাধন বাবু খুব একটা সমস্যায় পড়েন নি, টাকা দিয়ে কেসটাকে ধামাচাপা

দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মনের মধ্যে একটা অনুশোচনা তাঁকে তাড়া করে বেড়ায় এখনো। মাঝেমধ্যে গভীর রাতে তিনি চিৎকার করে ওঠেন। কখনো কাজ করতে করতে তিনি আনমনা হয়ে যান। এখনো তাঁর মন সেই ঘটনাটাকে মুছে ফেলতে পারেনি।

হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে তাঁর ধ্যান ভাঙলো, তিনি চমকে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। কাঁচুমাচু মুখে পাড়ার একটি বয়স্ক মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সত্যসাধনবাবুকে দেখে হাতজোড় করে বললেন, আমার নাম সাধন মন্ডল। আমি আপনার পাশের গ্রামে থাকি। এখন সোজা হাসপাতাল থেকে আসছি। আপনার ছেলেকে সিরিয়াস অবস্থায় ভর্তি করেছি। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার মধ্যে পড়েছিল । হয়তো কোন লরি তার উপরে চালিয়ে দিয়েছে। আপনাকে একটিবার হাসপাতালে যেতে হবে এখনই। সত্যসাধনবাবুর মুখ থেকে কোন কথা বেরুলো না। যে ঘটনাটিকে তিনি ধামাচাপা দিয়েছিলেন টাকার জোরে, সেটিই যে আবার এভাবে প্রত্যাবর্তন করবে, তা বুঝতে পারেননি।

---

**খেলাঘর** **সুতপাব্যানার্জী(রায়)**

ওসমান এক-গা কাদা মেখে উঠে এল। যেন ঐ ন্যাড়া বিলে ঝাঁপ দিয়ে এইমাত্র উঠল। ঐ বিল বর্ষাতেও বুকে জল ধরতে পারে না। খালি কাদা উঠে আসে। আসমা দূর থেকে ওকে দেখেই চিৎকার করে উঠল- "স্কুল যাস পড়তে না কাদা ঘাঁটতে ?" একমুখ হাসিতে ওসমানের নির্বিকার উত্তর- "ফেরার পথে ঐ বিলের কাদায় ক'টা শিঙি দেখলাম। তুই ভালোবাসিস তো আম্মা, তাই এই দেখ, এ ইরুমালে করে ক'টা নিয়েএয়েছি।" আসমার রাগ এবার গলে জল হল। সংসারে কেউ ওকে ভালোবাসুক না বাসুক, এই ছেলে তাকে চোখে হারায়। আসমার কোনটা ভাল লাগবে, তার জন্য ও প্রাণপাত করে। ওর জন্য চিন্তাতে আসমাকে মাঝেমাঝে ওর প্রতি রূঢ় হতে হয়। শিঙি ক'টা কেটে বেছে তাড়াতাড়ি ধুয়ে ফেলল আসমা। মা-ছেলেতে মাছের ঝোলভাত আয়েশ করে খাবে। তবে, ওসমানের মদ্যপ বাপের জন্যও কিছুটা তুলে রাখতে হবে। খেলে খাবে, না খেলে না খাবে। মাতাল মানুষের মর্জি বোঝা ভার। মাতাল অবস্থায় ওসমানের বাপের সব দৌরাত্ম্য আসমা সয়ে নেয়। তবে, ঐ অবস্থায় ওসমানের ওপর অকারণ জুলুম, মারধর করা সে একেবারেই মেনে নিতে পারে না। স্তিতধী ছেলেটা বাপের মতো শুধু নির্মাণ-শ্রমিক হয়ে বাঁচতে চায় না। ওর দু'চোখ জুড়ে স্বপ্নের বাতি। সে বাতিকে আসমা মাঝে মাঝে উসকে দেয়। একটা ভাল ভবিষ্যতের স্বপ্ন মা-ছেলেকে ঘিরে রাখে।

দিনগুলো আসমাদের কোনোরকমে কেটে গেলেও, রাত ওদের কাছে ভয়াবহ। এরকমই একটা রাতে ওদের বাড়িতে পুলিশ এল। বাড়ির জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে, ওসমানের স্কুল ব্যাগ থেকে টাকার পুঁটলি উদ্ধার করে, ওকে থানায় নিয়ে গেল। ওসমানের আব্বার নিরুদ্বেগ চেহারা দেখে সন্দেহ হওয়ায় ওকে অনুসরণ করে আসমা শুনল, ও এক শাগরেদকে বলছে- "কেমন ছেলেটার

নাম পুলিশের খাতায় তুলে দিলাম। লেখাপড়া শিখে ভদ্দরলোক হওয়ার শখ হয়েছিল। আসমা থানায় গিয়ে সব কথা খুলে বলে, বড়বাবুকে সাথে নিয়ে বাড়িতে হাজির হল। পুলিশের মারে ঐ শাগরেদ সব স্বীকার করল। আসমা আর এক দন্ডও ওখানে না দাঁড়িয়ে, ওসমানের হাত ধরে বলল- "আমি ওসমানের বাপেরে তালাক দিলাম। তালাক, তালাক, তালাক, তিনতালাক।

---

## গণেশ

**অরুণ কুমার সরকার**

ছোটবেলার কষ্টকর জীবনের কথা বললেও, আর বিশ্বাস করে না গণেশের ছেলেরা। বিশ্বাস করার কথাও নয়। তারা যে অনুভবও করতে পারে না, সে সময়কার সামাজিক অবস্থার কথা।

পাঁচ-পাঁচ দশ কিলোমিটার গ্রামের কাঁচারাস্তা হেঁটে স্কুলে যাতায়াত করতে হয়েছে গণেশকে। বর্ষার চিত্র তো ছিল একেবারে ভয়ংকর। নদীর গা ঘেঁষে স্কুল যাওয়ার রাস্তাটার ওপর দিয়ে সে-সময় জলের স্রোত বইত। খুঁজে পাওয়া যেত না পায়ে-হাঁটা রাস্তাটা। জল সরে গেলে, পড়ে থাকত হাঁটু-সমান কাদা। সেই কাদা খচে স্কুল করতে গণেশের পায়ের নিচটায় দগদগে ঘায়ের মতো হয়ে যেত।

এমন কষ্টেও লেখাপড়াটা ছাড়েনি গণেশ।

সেবার মাধ্যমিকটা ভালোভাবেই পাশ করল সে। মাধ্যমিকটা পাশ করতে-না-করতেই মনের মধ্যে যেন ছোট্ট এক স্বপ্ন জাগল। এ যেন, কবিগুরুর সেই 'ছোট প্রাণ, ছোট আশা'।

গণেশ এর-তার কাছে শুনেছে, বেসিক-ট্রেনিংটা করতে পারলে, প্রাইমারীতে চাকরি নাকি অবধারিত। আজ না-হোক, কাল চাকরিটা হবেই হবে।

গণেশ সেই স্বপ্নটাই দেখল।

বাস্তবটাকে অনুভব করে, গণেশ এর থেকে বড়কিছু আর ভাবতে পারল না। সামান্য এক মুহুরির কাজ করে, ওর বাবার পক্ষে ছেলেকে বড় কোনও স্বপ্ন দেখানোর সামর্থ্যও ছিল না।

গণেশ শেষপর্যন্ত বেসিক-ট্রেনিংটা করেই প্রাইমারীতে চাকরিটা পেল। মাধ্যমিকের রেজাল্টটা ভালো ছিল বলে, ওকে আর বসে থাকতে হল না বেশিদিন।

গ্রামে সে সময় গণেশকে চেনে না, এমন মানুষ বুঝি নেই।

গণেশ তখন গ্রামের মানুষের কাছে 'গণেশমাষ্টার' নামে পরিচিত। চাকরি পাওয়ার বছর পাঁচেক কাটতে-না-কাটতেই গণেশ নতুন এক স্বপ্ন দেখল। সে তখন সবে বাবা হয়েছে।

সদ্য সন্তানের পিতা হওয়া গণেশ গ্রাম ছেড়ে শহরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখল।

করলও ঠিক তাই।

সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে, গণেশ গ্রামে আর পড়ে থাকতে চাইল না। লেখাপড়া শিখতে সে নিজে যে কষ্টটা করেছে, সন্তানকে সেই কষ্টের মুখোমুখি হতে দিতে চায় না সে। তাছাড়া, যে স্কুলে সে চাকরিটা পেল, সে স্কুলেও যেতে হল

অনেকটা কাঁচা রাস্তা পার করে। ফলে, বর্ষার দুর্ভোগটা আর গেলই না ওর জীবন থেকে। গণেশ সন্তানকে ভালো লেখাপড়া শেখাতে চায়। অনেক অনেক লেখাপড়া শেখাতে চায়। সন্তানকে সে অনেক বড় মানুষ করতে চায়। সন্তানের ভবিষ্যৎ-জীবনের কথা ভেবে, সেবার গ্রামের সমস্ত জমিজায়গা বাড়িঘর বেচে, বাবা-মা এবং বোনদের নিয়ে গণেশ উঠে এল শহরে।

এই বয়সে শহরে এসে, ললিত বর্মণের কাজের খানিকটা সুবিধেই হল। কোর্টটা কাছে হল তাঁর।

কোর্টটা কাছে হল বলে, মুহুরির কাজ করতে তাঁর সুবিধেই হল। আগের মতো তাঁকে আর দশ-দশ বিশ কিলোমিটার রাস্তা সাইকেল চালিয়ে কোর্টে যাতায়াত করতে হয় না। শহরে চলে আসার পর, যেতে-আসতে বড়জোর তাঁকে এক কিলোমিটার মতো রাস্তা সাইকেলে যেতে হয়। কোনও কোনও দিন হেঁটেই যাওয়া আসা করেন কোর্ট-কাছারি। এই বয়সে তাঁর পক্ষে এটা ভালো বই মন্দ হল না।

গ্রামের জমি, গাছগাছালি পুকুরসহ খোলামেলা বাড়িটা বিক্রি করে গণেশদের এখন শহরের ছোট্ট এক বাড়ির পরিসরে অনেকটা যেন চিড়িয়াখানার পশুপাখিদের মতো বসবাস করতে হয়। এক-সময় ভোরের পাখিদের কলকাকলিতে যাদের ঘুম ভেঙে যেত, ভোরের নরম বাতাস যাদের গা ছুঁয়ে যেত, পুকুরের মাছেদের সাঁতারকাটা দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে আসত, শহরে এসে সেসব তাঁদের কাছে একেবারে অতীত হয়ে গেল।

গণেশ সেবার পিতৃহারা হলে, সংসার আর বোনদের সমস্ত দায়দায়িত্ব এসে পড়ল তার ঘাড়ে। সামান্য এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকরি করে গণেশকে তিন-তিনটি বোনের বিয়ে দিতে হল। শহরে এসে বাড়ির জমির ভাতও খেতে পারল না, পুকুরের মাছও খেতে পারল না। সব কিনে খেতে, সংসারে আর অবিশিষ্ট বলে তেমন কিছু আর থাকল না।

কানন বর্মণও স্বামীকে হারিয়ে খুব বেশিদিন আর বাঁচলেন না। গ্রামের খোলামেলা জায়গা ছেড়ে এসে শহরে তিনি যেন ঠিকমতো নিঃশ্বাসটাও নিতে পারলেন না। এক দমবন্ধকর পরিবেশকে মানিয়ে নিতে পারলেন না কিছুতেই। ফাঁপরে পড়ে গেলেন যেন। তাঁর মন সারাক্ষণ পড়ে থেকেছে কেবল ফেলে আসা গ্রামের সবুজ মাঠ, নদী, পুকুর, হাঁস, গরু, ছাগল, পাখপাখালিদের ওপর। শহরে এসেও সে-সবকে ভুলতে পারলেন না কিছুতেই।

সংসারের মস্ত এক বোঝা মাথায় নিয়েও গণেশ দ্বিতীয়বার সন্তানের বাবা হয়েছে। দুই ছেলের বাবা হয়ে গণেশের দায়দায়িত্বটাও বেড়ে যায় অনেকখানি। গ্রামের সমস্তকিছু ফেলে যে জন্য ওর শহরে আসা, নিজের সাধ্যমত সে চেষ্টাটা করে গেল সে। হাজারো প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও সন্তানদের সমস্ত চাহিদা মেটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করল। অজয় গণেশের বড় ছেলে। মেধা আছে ছেলেটার। সেও বাবার মতো মাধ্যমিক পাশের পর বেসিক-ট্রেনিংটা করে ফেলল। চাকরিটাও পেয়ে গেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। অল্প বয়সেই চাকরিটা পেয়ে, সে যেন অনেক বড় হয়ে গেল। নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত নিতে শিখে গেল।

অজয় সেবার কাউকে কিছু না জানিয়ে, সোজা বউ তুলল ঘরে।

ছেলের এমন এক কাজে গণেশ মনে আঘাত পেলেও, শেষে মেনে নিল সব।

গণেশের যত ভাবনাচিন্তা এখন বিজয়কে নিয়ে।

সরস্বতীর আশীর্বাদ যেন ওদের বাপ ছেলে সবার ওপর। বিজয়ও মেধাবী। ক্লাস ওয়ান থেকেই সে প্রথম হয়ে আসছে। ছোট এই ছেলের প্রতি গণেশের তাই বাড়তি নজর।

সেবার কী এক গোপন খবর নিয়ে এল অজয়। প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ নাকি শুরু হবে খুব শিগগিরই। কেবলমাত্র ভালো রেজাল্ট থাকলেই যে আজকাল চাকরি হয়, এমনটা নয়। অজয় কোথা থেকে এক গোপন খবর পেল, কোনও এক রাজনৈতিক নেতার পকেটে মোটা টাকা দিতে পারলে নাকি, প্রাইমারীতে চাকরি একেবারে নিশ্চিত।

অজয়, জয়ন্তীর জন্য দৌড়ঝাঁপ করল। জয়ন্তী, অজয়ের ভালোবেসে গোপনে বিয়ে করা বউ। অজয় বউয়ের চাকরির কথা ভাবল ঠিকই, কিন্তু উপায় ? সে তো চাকরি করে এতদিনে দু'পয়সাও জমাতে পারেনি হাতে। তাহলে ? টাকাও তো নেহাত কম নয়। কী করবে সে ভেবে পায় না। অবশেষে বাবাকেই ধরল সে।

কোনও উপায় না দেখে, গণেশকে অবশেষে ধার-লোন করে টাকাপয়সা সংগ্রহ করতে হল ছেলের বউয়ের চাকরিটার জন্য। যদিও শেষপর্যন্ত, সে কেবল নিঃস্বই হল, ছেলের বউয়ের চাকরিটা আর হল না।

সেবার বিজয় মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ চান্স পেল।

বছর দুই পড়তে মোটা টাকার প্রয়োজন। গণেশের সে সামর্থ্য আর নেই, আগেরই ধারদেনা পড়ে আছে। শোধ করতে পারেনি। নিরুপায় সে।

গণেশ নিরুপায় হয়েও ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে দিতে চায় না।

ছেলেকে একবার ভর্তি করাতে পারলে, আর কোনও চিন্তা থাকত না। কিন্তু এক সঙ্গে প্রায় দশ বারো লাখ টাকা সে পাবে কোথায় ? সে চিন্তায় গণেশের রাতে যেন ঘুমই আসে না।

নিরুপায়ে গণেশ শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেলল।

গণেশ ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে, একমাত্র সম্বল বাড়িটাকেই বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। গণেশের আর কোনও উপায় নেই। বাড়িটাকে বিক্রি করেই সে ছেলের স্বপ্নপুরণ করতে চায়।

গ্রামের সমস্ত সয়সম্পত্তি বিক্রি করে, এক সময় শহরের যে ছোট্ট বাড়িটায় উঠে এসেছিল গণেশ, যে বাড়িটাকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল অনেক স্বপ্ন, সে বাড়িটাকেও শেষপর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হল সে।

গণেশ যেন পুরোপুরি নিঃস্ব হল। মাথা-গোঁজার নিশ্চিত আশ্রয়টুকুও তার আর থাকল না।

মাথা-গোঁজার নিশ্চিত আশ্রয়টুকু হারিয়ে গণেশ সপরিবারে ভেসে বেড়াতে লাগল আজ এ বাড়ি, তো কাল সে বাড়ি। এক সময় যার দু-দুটি বাড়ি ছিল, পুকুর ছিল, জমি ছিল, সে হল কিনা গৃহহীন। গণেশের এখন ভাড়াটে জীবন। বউ ছেলের মাথার ওপর ছাদ দিতে তাকে এখন ছাদ ভাড়া নিতে হয়। স্বপ্নেও সে ভাবতে পারেনি এমন এক জীবনের কথা। সামান্য চাকরিটুকু ছিল বলে, কোনোমতে টিকে থাকতে পারল সে।

বিজয়ের চোখে বড় স্বপ্ন।

ছেলের সে স্বপ্ন নষ্ট হতে দিতে চায়নি গণেশ। বিজয় স্বপ্ন দেখে নোনা নীল জলের। বড় বড় ঢেউয়ের সঙ্গে সে ভেসে বেড়াতে চায় সীমাহীন সমুদ্রের বুকে। ছুঁয়ে আসতে চায় সমুদ্রের তলদেশ। শক্ত করতে চায় সে দেশীয় জলশক্তিকে।
ছেলের এমন সব স্বপ্নগুলোই যেন গণেশের চোখে ধরা দেয়। ভাড়াটে জীবনে ভেসে ভেসে ছেলের দেখা স্বপ্নগুলোকে সেও দেখতে চায় শক্ত এক মাটির ওপর দাঁড়িয়ে। যেখানে নোনা জল নেই, ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস নেই, হৃদয় খোয়ানো মায়াবী সৌন্দর্য নেই। আছে কেবল কঠিন এক বাস্তব। সেই বাস্তবের মাটির ওপর দাঁড়িয়ে গৃহহীন এক পিতা সেজে, গণেশ কেবল সন্তানের সুখটুকুই খোঁজে।

**প্রতিবিম্ব**

**তরুণার্ক লাহা**

জিষ্ণু দৌড়াতে শুরু করে। দশটা চল্লিশের বাসটা তাকে ধরতেই হবে। টিকিট আগেই কাটা আছে। বাসের চাকা গড়াতে শুরু করে। জিষ্ণু আর একটু বেগ বাড়ায়। বাসে ওঠার আগেই হঠাৎ ডানদিকে নজর যায়। গেটের হাতলটা ধরতে গিয়েও আর ধরা হলো না। চোখের সামনে দিয়ে বাসটা বেরিয়ে যায়। জিষ্ণুর সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। টিকিট কাউন্টারের ছাউনিতে এক ভদ্রমহিলা নীরবে বসে রয়েছেন। জিষ্ণু সম্মোহিত হয়ে সেদিকে পা বাড়ায়। ভদ্রমহিলা তাকিয়ে আছেন কাউন্টারের সামনে টাঙানো এক বিজ্ঞাপনের দিকে। জিষ্ণু তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞাপন থেকে চোখ সরিয়ে ভদ্রমহিলা জিষ্ণুর দিকে তাকান। নির্লিপ্ত গলায় জিজ্ঞেস করেন---কিছু বলছিলে বাবা ?

জিষ্ণু হতবাক। কী উত্তর দেবে খুঁজে পাচ্ছে না। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় তার বাবা জীবনবাবু বলেন--- দেখ জিষ্ণু, তোকে যে কী করে মানুষ করেছি তা আমিই জানি। তোর মা যেদিন আমাকে ছেড়ে চলে যায়, তখন তোর বয়স দু বছর। আমি বারবার আটকানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেদিন যেন ওর মাথায় ভূত চেপেছিল। আমার কোনো কথা না শুনেই তোকে আমার কোলে দিয়ে বলে---আমার সাথে কোনোদিন যোগাযোগ রেখো না। তুমি একজন নষ্ট চরিত্রের মানুষ।

তুই বড়ো হয়েছিস, বলতে দ্বিধা নেই, আমার অফিসের কিছু বদ লোক আমার নামে উলটোপালটা লাগিয়ে তোর মায়ের কান ভারি করে। আমাকে অবিশ্বাস করতে থাকে। অফিস থেকে ফিরলেই আমার ফোনটা কেড়ে নিয়ে সব সার্চ করত। একদিন খুঁজে পেল এক মেয়ের ছবি। আমি তাকে চিনি না, জানি না। কেউ হয়তো আমার ফোনে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেদিন আমার কোনো কথা না শুনে, শুধু সন্দেহবশে আমাকে ছেড়ে চলে যায়। বিশ্বাস কর এতে আমার কোনো দোষ ছিল না।

আমি কত খুঁজেছি, পাই নি। হয়তো বা আত্মহত্যা করেছে। আমি এখনো তোর মায়ের পথ চেয়ে বসে আছি। জিষ্ণু পকেট থেকে একটা ছবি বের করে ভদ্রমহিলাকে দেখিয়ে বলে----দেখুন তো, একে চিনতে পারছেন কিনা।

ছবি দেখে ভদ্রমহিলা বলেন----এ যে আমার মতোই দেখতে। ইনি কে হন ?

----আমার মা। ছেলেবেলায় আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আজও কোনো খোঁজ নেই। আপনি কি আমার সেই হারিয়ে যাওয়া মা ?

ভদ্রমহিলা আর একবার ছবিটা দেখে বললেন----একেবারে অবিকল আমার মতো দেখতে। কিন্তু তোমাকে বলি, আমি বিয়েই করি নি। আমি একটা অনাথ-আশ্রম চালাই। যদি সময় পাও, একদিন দেখে আসতে পারো। আমি বুঝতে পারছি, আমার উত্তরটা হ্যাঁ হলে সবচেয়ে তুমি খুশি হতে।

জিষ্ণু বলে---বাবা এখনো মায়ের অপেক্ষায় রয়েছে। বাবা সেদিন বলছিল, একটিবার তোর মা আমার সামনে এলে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব। আমি কিছু চাই না। মরণের আগে একবার তাকে দেখতে চাই। জানেন, ছোটবেলা থেকে মায়ের স্নেহ মমতা পাই নি। বাবা আমার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। আমি শুনেছি, মাকে বিয়ে করার জন্য আমার গোঁড়া দাদু বাবাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। বাবা তাতেও দমে যায় নি। হাসিমুখে মাকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। ক্লার্কের চাকরি করত। অল্প বেতন। তাতেও সুখের সংসার ছিল। আমার জন্মের সময় সবচেয়ে খুশি হয়েছিল আমার মা। মাকে খুশি রাখার চেষ্টা করত বাবা। অথচ সেই মা শুধুমাত্র লোকের কথা বিশ্বাস করে, আমাকে ছেড়ে চলে গেল নির্মমের মতো। একটি বারের জন্যও কি আমার কথা মনে পড়ল না? শুনেছি মা তার সন্তানকে ছেড়ে থাকতে পারে না। আমি তো কোনো অপরাধ করি নি।

জিষ্ণুর গলা ধরে আসে। ভদ্রমহিলা জিষ্ণুকে তাঁর পাশে বসতে বলেন। সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন----সবই নিয়তি বাবা। তুমি যেমন তোমার মাকে পাও নি, আমার মা বাবা আমাকে এক বাজে নোংরা লোকের সাথে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা

করেছিল। আমি বেঁকে বসি। আমার মা-বাবা এতটাই খারাপ যে, আমাকে ঐ বদ লোকটার হাতে তুলে দিতে টাকা নিয়েছিল। আমি সব খবর পেয়েছিলাম। একদিন চুপিসারে সংসার ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কী বলব বাবা, ছেলেরা অনায়াসে বাইরে রাত কাটাতে পারে। একটা একা মেয়ের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমাকে স্টেশনে একা ঘুরতে দেখে একজন লোকের সন্দেহ হয়। আমাকে জিজ্ঞেস করে---তুমি এখানে কী করছ ? কোথায় যাবে ?
লোকটার চেহারা কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিল, মন্দ নয়। বিশ্বাস করে বলেছিলাম---আমি ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। আমার এখন কোনো আশ্রয় নেই।

লোকটা বলল---আমি এখানকার স্টেশন-মাষ্টার। আমাকে ভরসা করতে পারো। চলো, তোমাকে আমার অফিসে নিয়ে যাই। প্রথমে ভেবেছিলাম, চারদিকে মন্দ লোকের ছড়াছড়ি। আমার কোনো ক্ষতি করে দেবে নাতো ? আমার মনের কথা হয়তো মানুষটা বুঝতে পেরেছিল। একজন মহিলা আর.পি.এফ কে ডেকে বলল---এই যে সবিতা, তুমি এই মেয়েটিকে তোমার কাছে রাখবে। কোনো অসুবিধা যেন না হয়।

সবিতা আমাকে নিয়ে গেল। কী ভালো মেয়েটা। ওর সাথে রাতটা কাটালাম। রাতে শুয়ে আমাকে বলেছিল---তোমার কপাল ভালো যে, রাধামাধবদার নজরে তুমি পড়েছিলে। নাহলে এই স্টেশনটা যে কত ভয়ঙ্কর, ভাবতে পারবে না। তোমার নির্ঘাত সর্বনাশ হয়ে যেত। তুমি রাধামাধবদাকে বিশ্বাস করতে পারো। মানুষটা খুব ভালো।

আমি সবিতাদির কথামতো রাধামাধবদার সাথে ওর বাড়ি গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, কে জানে - ওর বাড়ির লোক কীভাবে নেবে। কিন্তু,ওর বাড়ি গিয়ে আমি তো হতবাক ! ওর বাড়িতে সাত আটটি বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে রয়েছে। তারা সবাই অনাথ।একজন বয়স্কা মহিলা তাদের দেখাশোনা করে। আমি জানতে চেয়েছিলাম----আপনার সংসারে লোক কোথায় ?

রাধামাধবদা মুচকি হেসে বলেছিল---এরাই আমার সব। এরাই আমার সংসার। তুমি যদি চাও, এই সংসারে থাকতে পারো। মেনকাদি একা পারছে না। তুমি থাকলে ওর খুব সুবিধা হয়।

আমি আর অন্য কিছু ভাবি নি।একটা মানুষ যদি নিজের সব উজাড় করে অনাথ ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে পারে, তাহলে আমি কেন পারব না ? সেদিন থেকে রাধামাধবদার বাড়িতে থাকার জন্য আমার পাকা ব্যবস্থা হয়ে গেল। দিন-দিন আমাদের ছেলেমেয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আমার সুদক্ষ পরিচালনায় আমাদের আশ্রমের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সত্যি বলতে কি, অনাথ ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করতে করতে, নিজের বিয়ের কথা ভুলেই যাই। আমি ভাবতাম, আমার সংসার হলে, তখন এই ছেলেমেয়েদের কে দেখবে ?

জিষ্ণু বিভোর হয়ে ভদ্রমহিলার গল্প শুনে যাচ্ছিল। চারপাশের কোলাহল, হই-হট্টগোল কিছুই কানে ঢুকছে না। মোবাইল খুলে একজনের ছবি দেখিয়ে জিষ্ণু বলে---আচ্ছা দেখুন তো, একে কোনোদিন দেখেছেন ?

ভদ্রমহিলা গভীরভাবে ছবিটা দেখে বলেন---না বাবা, আমার নজরে কোনোদিন আসে নি। তবে আমার অনুমান এ তোমার বাবার ছবি। জিষ্ণু হতবাক হয়ে বলে----আপনি বুঝলেন কী করে ?

মৃদু হেসে ভদ্রমহিলা বলেন----বললাম না, আমার অনুমান। তোমার চেহারার সাথে অনেক মিল আছে। যে-কেউ বলতে পারবে। তা বাবা, আমাকে পরীক্ষা করছিলে ?

জিষ্ণু ভাষা খুঁজতে থাকে----না মানে, এমনিই...

----আমি বুঝি বাবা। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, আমি তোমার মা নই। তবে তুমি আমাকে মা বলে ডাকতেই পারো। এই মা ডাকটা আমার ভীষণ ভালো লাগে। আশ্রমের ছেলেমেয়েরা যখন মা বলে ডাকে, তখন আমার জীবনের সব অপূর্ণতা দূর হয়ে যায়। নতুন উদ্যমে কাজ করি। ওদেরকে আরো বেশি ভালোবাসি।

জিষ্ণু ভদ্রমহিলার হাতটা ধরে বলে----মায়ের ভালোবাসা এই জীবনে পেলাম না। মায়ের ছবির সামনে রোজ একবার কাঁদি। বিশ্বাস করুন, আপনাকে দেখে মনে আশা জেগেছিল, হয়তো আমার হারিয়ে যাওয়া মাকে ফিরে পেয়েছি।

জিষ্ণুর চোখ দুটো ছলছল করে উঠে। ভদ্রমহিলা সান্ত্বনা দিয়ে বলেন----কেঁদো না বাবা। তোমার কষ্ট আমি বুঝতে পারছি। আচ্ছা, তুমি কী একবার আমার আশ্রমে যাবে ? গেলে বুঝতে পারবে, তোমার মতো কতো সন্তান নিজের মা-বাবাকে হারিয়ে বেঁচে আছে।

জিষ্ণু হঠাৎ বলে উঠল---আপনি একবার আমাদের বাড়ি যাবেন ?

----কেন ?

----এমনি। মাঝে মাঝে যখন দেখি, মায়ের ছবির সামনে বাবা বিড়বিড় করে কিসব বলে যাচ্ছে, তখন মনটা ভেঙে যায়। মা হারানোর কষ্টটা আরো বেড়ে যায়।

ভদ্রমহিলা হাতঘড়ির দিকে চোখ ফেরান। ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে বলেন---এটা রাখ। আমার নাম ঠিকানা। যখন মন চাইবে, আমার কাছে চলে যাবে। যে মাকে হারিয়েছো, তাকে খুঁজে না পেলেও, একটা প্রতিবিম্ব তো অন্তত দেখতে পাবে। ছবিতে একটা নির্বাক মায়ের প্রতিচ্ছবির পরিবর্তে, একটা জীবন্ত মায়ের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে।ওই দেখ, আমার বাস এসে গেল। আজ চলি। ভালো থেকো বাবা। অবশ্যই আমার আশ্রমে যেও।

পাশে নামানো ব্যাগটা তুলতে যাচ্ছিলেন ভদ্রমহিলা। জিষ্ণু বাধা দিয়ে বলে----আপনি চলুন।আমি ব্যাগটা বাসে তুলে দিচ্ছি।

ভদ্রমহিলা আলতো হেসে বলেন---লক্ষী ছেলে আমার ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস ছেড়ে দেয়। জানলা দিয়ে মুখ বাড়ান ভদ্রমহিলা। তখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে জিষ্ণু। অপলক তাকিয়ে আছে সেই জানলার দিকে। বাস ছেড়ে দেয়। ধীরে ধীরে বাসটা দূরে সরে যায়। জানলায় বাড়ানো মুখটা তখনও দেখা যাচ্ছে। একসময় পথের বাঁকে হারিয়ে যায় সেই বাসটা। শূন্য রাস্তায় জিষ্ণুর চোখ তখনো আটকে। মনে মনে ভাবছিল, এই সময় যদি বাসটা খারাপ হয়ে যায়, তাহলে বেশ হতো। আরো কিছুক্ষণ তার মায়ের প্রতিবিম্বকে দেখতে পেত। ভদ্রমহিলার নাম ঠিকানা লেখা কার্ডটা তার হাতে ধরা। সেদিকে না তাকিয়ে জিষ্ণু বিড়বিড় করে বলে--মা,তুমি আমাকে ফাঁকি দিলে ?

হঠাৎ একটা লোক বাস ধরার জন্য দৌড়াতে গিয়ে জিষ্ণুর সাথে ধাক্কা খায়। লোকটা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে দ্রুত বাসে উঠে যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই জিষ্ণু লক্ষ্য করে, তার হাতের কার্ডটা ছিটকে গিয়ে পড়ল পাশের ড্রেনের প্রবহমান নোংরা জলে। অনেক চেষ্টা করেও উদ্ধার করতে পারল না কার্ডটা। কোথায় হারিয়ে গেল মুহুর্তের মধ্যে। একটা সম্ভাবনার মৃত্যু হল। দু'বছর বয়সে মাকে হারিয়েছিল, আজ চব্বিশ বছর বয়সে সেই মায়ের প্রতিবিম্বকে হারিয়ে ফেলল। বিড়বিড় করতে করতে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করে জিষ্ণু। কোথায় যাবে সে জানে না। মাথার ওপর তখন গনগনে রোদ।

---

**দুঃখের মতো * সঙ্গীতা মুখার্জী মণ্ডল**

আমার নিজস্ব কোনো আকাশ নেই,
আমার হাতের মুঠো নেই, পায়ের পাতায় অজস্র শিকল।
কথাদের দাম কমেছে, আস্কারা বলতে ছোটো ছোটো দুটো হাত সাহারা
ইচ্ছেরা আসে আবারো চলে যায় হারিয়ে যায়
ভূগর্ভের ভিতর তলিয়ে যায়,
আমার মাথা থেকে পা অবধি দায়বদ্ধতা,
চার দেওয়ালের ভিতর সমস্ত শক্তির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া
সুসম্পন্ন
কোথায় একটাও ফুটো নেই, কতদিন হলো আলো দেখি না
অন্ধকারও ঠিক মতো স্পষ্ট নয়
সমস্ত সংসার ভর্তি মাকড়সার জাল বিছানো
আটকে গেছে হাতা, খুন্তি, মাসকাবারিতে।
আমার আর বৃষ্টি দেখা হলো না,
মেঘের ঘরে রামধনুর আলপনা
গোধূলির আমন্ত্রণে পথ চলা হলো না,
ইদানিং শব্দেরা ভ্রমর হয়ে যায়
দুঃখের মতো।

**সাঁকো * নীলেশ নন্দী**

তোমায় বেঁধে রাখতে চেষ্টা করিনি
ভালোবাসার বন্ধনে,
জীবনের উৎসমুখে নিভৃতে হাসে হতাশা,
চিরহরিৎ আলোয় সূক্ষ্ম অনুভূতিরা
পথ দেখে প্রাচীন পদ্ধতির,
সংকীর্ণ চোরাগলিতে শূন্যপথ বেয়ে নেমে
আসে অস্ফুট জ্যোৎস্না,
অনর্থক অবহেলায় অভিমানেরা ভিড় করে
মনের গভীরে,
গোটা মনন জুড়ে নিস্তব্ধতা বপন করে
অপ্রাপ্তির বীজ,
ভাঙা সাঁকোর দু'পার জীবনের অঙ্কের
হিসেব জানল না,
এপারে নেহাতই মিথ্যে প্রেমের প্রলোভন,
ওপারে চলাচল করে আমাদের সুখযাপনের
দিনগুলি।

## সময় ও অন্তরাল * হরিপদ বিশ্বাস

সময়টা বড্ড এলোমেলো,
চারিদিকে ছড়িয়ে আছে শুধু ভাষণের জোয়ার,
প্রতিপক্ষও মুখিয়ে আছে, উত্তর যেন তৈরি,
সাধারণ মানুষের অভিজাত বৈশিষ্ট্য চিরকাল মুখ বন্ধ রাখা,
ব্যতিক্রম হবে বলে আশা নেই,
হিংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আদম্য খেলায়,
চারিদিকে শুধু শঙ্কার গন্ধ,
এপাশ ওপাশ সব পাশেই বেমানান অঙ্ক,
বারুদের ঝাঁঝাল গন্ধ নাকে প্রবেশ করতে ব্যর্থ,
মানুষ অভ্যাসের দাসে পরিণত।

সামগ্রিক অতীন্দ্রিয় প্রহরা বিদ্যমান,
জল্পনা এনে দেয় বিতৃষ্ণা,
হায়নার দলেরা খুঁজে বেড়ায় অসহায় হরিণীকে,
প্রাকৃতিক শক্তিকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখিয়ে কৃত্রিমভাবে,
সাবলীল গঠন-প্রণালী আর অরাজক পরিস্থিতি,
সৃষ্টিও যেন বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে,
অকথিত অদৃশ্যমান সাময়িক,
এবং রূপক হিসেবে কথামালার ভিন্ন রূপভেদ;
সমাজের কুসংস্কারের চালুনিতে চোরা ছিদ্র,
বাইরের রঙচঙে জাতীয় সংস্করণ মুখোশের বিমূর্ততার প্রতীক;
যেন সততার প্রথম স্থান ও...

## দেশমাতৃকার জন্য * সাগর মাহাত

(১)
সমস্ত রঙিন ফুল ঝরে পড়লে
দাবানল জঙ্গল ঘিরে ফেললে
চারিদিকে শোনা যায়
যন্ত্রণার তীব্র আর্তনাদ ।
কেউ আছো ? দয়া করে পর্দাটা টেনে দাও
আমি দেখতে চাই না বুক কাঁপানো
মা আর শিশুর বিচ্ছেদের ছবি ।

(২)
'বিশ্বাস' শব্দটি লুপ্ত হতে হতে বিলুপ্তের পথে
আমার অনেক কিছু বলার আছে
অনেক কিছু করার আছে
রাষ্ট্রের স্বার্থের কথা ভেবে
অনেকটা পথ পাড়ি দেবার আছে
কিন্তু বিশ্বস্ত সেই হাতের সন্ধান পাচ্ছি না।

(৩)
ডাক শুনে কেউ আসুক না আসুক, পাড়ি আমি
দেবো।
আপ্তবাক্যে ভর করে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ঠেলে
মেলে ধরবো ডানা - কৃষির জন্য, সবুজের জন্য,
নদীর জন্য।

## ঘর * সুভাষিতা ঘোষ (দাস)

সন্ধ্যা নামছে
গোধূলির এক চিলতে রাঙা আলো
মিশে যায় দিগন্তরেখায়,
আমি আর কে !
শুধু অমলিন হাসিটুকু সঙ্গে নিয়ে
তাকিয়ে থাকি তারার দিকে, ঘরের অপেক্ষায় !

আমার ঘরের পাশে তারার বাড়ি
সামনে বয়ে যায় জ্যোৎস্নার ঢেউ
উঠোনে ফুটে ওঠে ঝিকিমিকি আলো-রাঙা ফুল
কেউ বা খসে পড়ে টুক করে; জন্ম নেয় কেউ !

রাত্রি ঘনায়
ওই দূরে দেখা যায় আকাশগঙ্গার পথ
শুধু অমলিন হাসিটুকু সঙ্গে নিয়ে
আমি তাকিয়ে থাকি অপরূপ শূন্যতায়...

## লিখবো বলে বসে আছি * দীপকুমার

আমি লিখবো বলে বসে আছি   তোমার কথাগুলো
কোন সে ভয়ে হয় না   লেখা জমছে   পাতায় ধুলো
তুমি হাওয়া হয়ে আসতে পারো    আমার খোলা জানালা
ঘরের ভিতর ঘর যে কেবল    আমি একেলা....সারাবেলা

আমি মনে-মনে লিখি যা    মুছে ফেলি সবই তা
ভালো লাগলেও ছন্দ ভীষণ   ভাবি এ তোমার পছন্দ না
তুমি বৃষ্টি হয়েও আসতে পারো    আমার  খোলা ছাদমালা
ঘরের ভিতর ঘর যে কেবল আমি একেলা....সারাবেলা !

## নিসর্গ প্রজনন * বিকাশ চন্দ

সেদিনের সকালের সূর্য দেখেনি
কপালের জন্মদাগে ছুঁয়েছিল বাঘিনীর থাবা
অলীক সময়ের খাপছাড়া কথা বুনছে কেউ
ফুসমন্তরে বদলে দিচ্ছে
পূর্ব আর উত্তরপুরুষের কথার বুনট

চন্দনপিঁড়িতে শুকোচ্ছে চন্দনের বাটা
কপালে শুকিয়ে কাঠ রক্ততিলক
অচলা সময় চেপে বসে
মানুষের বুকে জমে মৃত সম্পর্কের পাথর

সকল স্বৈর সময় জানে সাক্ষী ধ্রুবতারা
অরব হৃদপিণ্ডেরা শব্দ খুঁড়ে অক্ষর বানায়
অনুক্ত অক্ষরেরা কখন যে গান হয়ে ভাসে
আমাদের ভালোবাসা কুয়াশা মাখে নির্জনতায়
ঋতুরাগে মেতেছে একা বিশ্ব-নিখিল
জানেনা নিসর্গ প্রজনন সময়ে স্থির অনন্ত
নিয়তি



## তোমার লেখনী * বিন্দাস ভার্গব

তোমার লেখনী কবে দাম পাবে
ভাবীকাল সেটা জানে,
আজকে অনেকে বলছে তোমায়
লেখনীর নেই মানে।

বলছে যারা বলুক তারা
বন্ধ কোরো না লেখা,
কত কবিতা দুনিয়া কাঁপালো
নিজের  চোখে দেখা।

এমনি করেই কখন লেখনী
লেগে যাবে কার ভালো,
তোমার লেখা মানুষের প্রাণে
জাগাবে  জ্ঞানের আলো।

কেউ পায় কেউ সকলই হারায়
এই জীবনের খেলা,
থেমে থেকোনা বন্ধু আমার
বয়ে যায় কত বেলা।

## ইলশেগুঁড়ি  * সুব্রত  চৌধুরী

সবুজ রংয়ের গাছের পাতা
অঙ্গন জুড়ে রঙ্গন-কুঁড়ি,
মাল্টিকালার রংয়ের খাতা
রঙিন পাখি যাচ্ছে উড়ি।

নদীর বুকে ময়ূরপঙ্খী
পতপত ওড়ে রঙিন পাল,
রংবেরঙের ফুলের ডালা
শস্যক্ষেতের সবুজ ডাল।

ফড়িং বেড়ায় পুকুর ধার
পাপড়ি মেলা শতদল,
হাওয়ায় ওড়ে শাড়ির পাড়
আলতা পায়ে রূপোর মল।

ইন্দ্রধনু মনটা কাড়ে
ইলশেগুঁড়ি আকাশ গায়,
বাউলা-গানে মনটা টানে
অচিনপুরে খুশির নায়।

## শিকড় আবহমান * কৃপাণ মৈত্র

সেই উঠোনটা সেই উঠোনই আছে
ঘাসজাগা মেঝে পিঁপড়েটানা মাটি
লতায়-লতায় একই জড়াজড়ি।

ওদিক দেখো ঝকঝকে সবকিছু
আকাশছোঁয়া শত-শত বাড়ি
বিদেশ-বিদেশ সারা গন্ধ গায়।

দাঁত বের করা ইঁটগুলো সব হাসে
দেওয়ালে দাগ ঋতুর আল্পনা
পাখির বাসা সাপের গোপন গহ্বর,
দোলনা ঝোলার রিং করা বলয়
মজাপুকুর  ভাঙা শিউলিতলায়
শ্রী হারানো তুলসীমঞ্চের শোভা
অবশিষ্ট আম-আতা  মনোলোভা ।

ওদিকে শব্দ কান-ফাটানো
গাড়ি-ঘোড়ার
হাজার হল্লা  অবিরাম স্লোগান,
হেথায় আজান আমেন গায়ত্রী
ভালোবাসার সূতিকাগার, শিকড়
আবহমান  ।

## নিজস্ব বৃত্তের বাইরে * উদয়ন চক্রবর্তী

এরপর তুমি বলেছিলে হেঁটে যাবার কথা
যদিও তুমি ভেবে বলোনি
আমি জানতাম তুমিও জানতে আমরা দুজনেই
একটা ভুমিকাকেই ভেবেছিলাম
পাকাপাকি এ তমসুক যা ছিঁড়ে যাবে না
যদিও সেখানে
নির্ভরতা একটা পরিখা তৈরি করে বলেছিল
ভেবে দেখতে বলা কথার গভীরতা আসলে কতটা গভীর

ফুলেরাও বারবার মৌমাছিকে বলে একবার
ভেবে দেখতে অস্থায়ী প্রেমের
দুর্বলতা ঠিক কোথায় গিয়ে পথ হারিয়ে অনাথ হয়

আর বিষাদের কবিতা লেখে জীবন
যা থেকে বোঝা যায় পরিণতির কোনো
ভরকেন্দ্র নেই ব্যর্থতার নিজস্ব বৃত্তের

তাই আমি আমরা কখন গিরগিটি হয়ে গেছি
বুঝতেই পারিনি বোঝা যায় না
এর মধ্যে ঠিক কখন আমার পরিচিতরা
হায়না হয়ে গেছে বিনা-অজুহাতে
সেটাও জানতে পারিনি

আর সে-জন্যেই আমাদের এ পরিবর্তন
যখন বুঝলাম, ততক্ষণ
আমার ছায়া ছোট হয়ে দিগন্তে পৌঁছে গেছে
নিজস্ব বৃত্তের বাইরে
আমাদের পৃথিবীও ফিরে যেতে চাইছে তার
বরাদ্দ বৃত্ত ছেড়ে অন্য কোনো বৃত্তে।

## বসন্তসেনা * তাপসী লাহা

প্রজাপতির মতো আলো করে আসে একসময়
স্তব্ধ পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আগুনরঙা ক্রোধ,
আগুনের তারল্য
হাতের মত আঙুলের নকশায় আকৃষ্ট পাখিরা ভীড়
করে ডালে-ডালে
অসময়ের লাঞ্ছনায় মুখ লুকিয়ে কাঁদে সে
বিশ্বাস ভেঙে চুরমার করে রেখে গেছে তার
মুঠো চুল ধরে অত্যাচারী রাজা টেনে নিয়ে যায়
মৃতদেহের দেশে।
সে কি যেতে চায় !
প্রতিরোধ নেই, তাই ছুঁড়ে দেয় তাকে খুঁজে পাওয়ার
সংকেত
একদিন মাটির আঁধার থেকে দীপ্ত স্বর ভেসে আসবে
জানাবে কোথায় হারিয়ে গেছে ঘরের মেয়েটি।

কে আজ মাটির ঋণ মেটাবে,

কলঙ্কের রাধাভাগ থেকে কৃষ্ণস্বর হয়ে
কালদমনীয় সুর চড়াবে বাঁশিতে।

ফিরে আসবে সে, এই পৃথিবীর সবথেকে নিষ্কলঙ্ক
মেয়েটি,
প্রকৃতিজায়া, বসন্তসেনা !

## গোপন কথাটি * উৎপলেন্দু পাল

জীবন থেকে একটা হসন্ত খুলে পড়লে
দাড়ির ডগায় ঝুলে থাকে বাবুই পাখির বাসা
খুলে যায় চিলেকোঠার নৈঋত কোণের জানালা
কোনও এক আম-আঁটি চোষা গদাইলঙ্করী বিকেলে

ঝিঙে ফুল যেন নবযৌবনা মুগ্ধ প্রেমিকা
ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে নিষিদ্ধপল্লীর গলির আড়ে
উড়ে যায় কোনও রাতচরা ভ্রমরের গুপ্ত মানসাঙ্গ
দু'দিকে বেল লাগানো বাউল মতলবি বাইসাইকেলে,

কবিতার লাইনে ঝুলে থাকা দেশলাই কাঠি
ধোঁয়া ছাড়ে কোনো আগুনের হলকা ব্যতিরেকে
হাতছানি দেয় মধুমাখা সোনা কিংবা রুপোর চামচ
গদ্যগন্ধী কোনও আদিরসাত্মক বিকৃত মাতাল অবসরে

মৃত্যুর মাঝে একটা যুতসই রেফ জুড়ে দিলে
দোয়েলের ঠোঁটে বেজে ওঠে বিমুগ্ধ ভৈরবী সুর
ঘাতকের খাপখোলা ধারালো তরবারিও হেসে ওঠে
নবরত্ন খচিত গোপন কোনও লজ্জাবিহীন রাজ দরবারে।

## হৃদয়ের ভাঁজে * তাপস সরকার

কখনো-কখনো যা দেখা যায়,
কিংবা যা শোনা যায় তা ঠিক নয়;
মেঘে ঢাকা আকাশ অথবা
তার গর্জনে বর্ষা কি সবসময় হয় ?

মানুষের মুখ মনের দর্পণ,
তবুও কি
মুখোশের আড়ালের মানুষটার
মুখের সুখ অথবা দুঃখ,
বোঝা যায় ?

শান্ত জলধির গভীরে স্রোতের অন্তরালে,
একটা অশান্ত ঢেউ খেলে ;
হাড়-মাংসের আবরণে ঢাকা...
হৃদয়ের ভাঁজে লুকোনো ব্যথা বোঝেনা,
হৃদয়ের স্পন্দনে অনুভূত না হলে ।

### কবিতা * সৌম্যস্বপন চক্রবর্তী

" আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে ।"
কবিতার সাথে মানুষের যোগসূত্রের প্রশ্নটি যখন
অমীমাংসিত :
আমি প্রেমিকার কাছে গেছি
ভোগ ।
সমাজসেবীর কাছে গেছি
দম্ভ ।
ধর্মের কাছে গেছি
প্রাচীর ।
কবি সম্মেলনে গেছি
আত্মপ্রচার ।
সময় বললেন
তুমি দর্পণের কাছে যাও ।
কবিতা ও মানুষ সমার্থক ।
আমি জীবনে একটি কবিতাও লিখি নি ।

### মায়া * পলাশ পাল

তোমার তৈরি পথের দু'ধারে দুটি মন
আর মাঝপথে হিংসা
অবহেলার প্রেমে মজেছে
তবুও,
সম্পর্কগুলো শরতের রঙ মেখে
ডাইরির পাতা থেকে উঠে এসে
পাতাহীন গাছের ডালে ঘর বাঁধে
আর আমি
হিংসার চোখে চোখ রেখে
একটা মন ছুঁলেই
অন্য মনের ডালে
বসে থাকা মায়া
স্পর্শ করে জীবনের মানচিত্র...

### লাশ-পাহাড়ের কথা * অসিকার রহমান

' মহাভারতের কথা অমৃত সমান '
জতুগৃহ পুড়ে যায়
মানুষ পোড়ে না, মরেও না ।
এ যুগের মহাকাব্যে সবই ভষ্মীভূত...

ক্রমাগত ঘনীভূত আগুন গোটা গ্রামকে হজম
করে
চিতাভস্ম আকাশে উড়ায়,
নিরুপায় সময় অদৃশ্য অশ্রু ঝরায় সারারাত।

যে পাহাড়ে বরফ জমেছিলো
যে পাহাড়ের পাদদেশে পরিরা খেলতো,
পরিদের জ্বলা শরীর ভেঙেছিলো হিমালয়
জলধারা জ্বলন্ত গ্রামকে ধুয়ে দিলো।

সারিবদ্ধ পোড়া লাশগুলো ক্ষোভের পাথর হয়ে
গড়ে তুলছে আকাশচুম্বী পাহাড়

এই লাশ-পাহাড়ের কথাও 'অমৃত সমান'

### এলাম আমি * গঙ্গাধর সরকার

তোমরা চাইছ তাই এলাম আমি
রাস্তা জুড়ে পাথরনুড়ি খেলে বেড়ায় শুধু
সাধের কাজল স্বপ্ন দেখে
চোখেই কেন আছে
মেঘের বৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে,
তাই শম্পা ঝিলিক সৃষ্টি

**দেহি পদপল্লবমুদারম * সুদীপ কুমার চক্রবর্তী**



পৌরাণিক কড়চায় সেই শ্রুতিভাষ্য ভাস্বর প্রেম
কাহিনী !
অজয় নদীর বাঁকের সে পর্ণকুটির।
মোমের চাঁদ গলে-গলে পড়ছে মোহনায়।
জয়দেব ফিরছে - পদ্মাবতী রয়েছে অপেক্ষায়।
দ্বাদশ শতাব্দীর কেঁদুলির কাল্পনিক চিত্রপট ।
প্রণয় গন্ধে এখন আমি শব্দব্যূহে ঢুকে পড়েছি।
অচেনা জনপদে হাঁটছি আর হাঁটছি।
লৌকিক থেকে অলৌকিক -
যাপন ছায়ায় এ এক চলমান এপিক।
প্রায় প্রতিটা প্রেমের উপমায় এক একটা নদী
আর তরঙ্গ দর্পণ।
নিঃসঙ্গ কৃষ্ণের আর এক শ্রীময়ীর প্রেমের
আখ্যান চিরন্তন।
হয়তো বা সে কোনো পদ্মাবতী !
অনন্য প্রেমের সাতরঙা রামধনু রঙ।
শেষপর্যন্ত শ্রীরাধার সমীপেই সেই আত্মসমর্পণ

এক শাশ্বত অনিন্দ্যসুন্দর সে উচ্চারণ -
দেহি পদপল্লবমুদারম !

**নিস্তরঙ্গ স্মৃতির সাঁতার  * সমরেশ মণ্ডল**

বই পড়তে পড়তে ক্লান্ত দু'টি চোখকে শান্তি দিতে চশমাটি
নামিয়ে রাখি বইয়ের খোলা পাতার ওপর, ঠিক ওইটুকু
আয়াসে পাতার উপর যদি নামিয়ে রাখি কয়েকটি লাইন !
নাতির দেওয়া ডটপেন, সাদা মসৃণ প্যাডের পাতা যেন
সাদা রাজহাঁস, একটুও ঢেউ না তুলে নিস্তরঙ্গ সাঁতার কেটে
চলেছে দিঘির কিনার থেকে কিনারে।
কেউ ডাকেনি কেউ বলেনি পুবের আকাশ কেমন সাদা
থান থান, ব্যস্ত পৃথিবীর বুকে এই ক্ষণটুকু আঁকার জন্য
হঠাৎ আকাশ নেমে এলো খোলা সাদা প্যাডের পাতায়।
কিছুই লিখছি না, চোখে ভেসে আসছে একটি খেয়া-নৌকা
পারে বাঁধা,  দোকান থেকে চপের মশলা তৈরির গন্ধ
অথচ মাঝি ছাড়া কোনো যাত্রী নেই আজ। কিছু লেখার
চেয়ে নাতিকে বলি, রুক্ষ ধূসর দেশে জন্মালে কী হবে
একটি নদী, নৌকা, বটগাছের নিচে বাঁশের বেঞ্চ এঁকে দিবি, ভাই !



**দাগ * অতীশচন্দ্র ভাওয়াল**

আমার পিঠে এখনও দেশভাগের দগদগে দাগ
যন্ত্রণায় ঘুমোতে পারি না সারারাত
এ-পাশ ও-পাশ করি
হঠাৎই পিঠে অজানা স্পর্শ, হাতে রাম দা
পেছনে শত পৈশাচিক উল্লাস
আমি ছুটি প্রাণপণ, কোথায় মা, কোথায় বাবা
কোথায় আমার ভাইবোন ?
নিজের প্রাণ বাঁচাতে ছুটি দিগ্বিদিক ।
অবশেষে আমি প্রাণে বাঁচি বটে
ছুটতে ছুটতে, ছুটতে ছুটতে
সীমান্ত পেরিয়ে অন্যদেশ
খুঁজে পাইনি আর কোথায় আমার
বাবা-মা, আমার পরিজন ?
সীমান্তের ওপারে আজ আবারও শুনি
আমার সহোদরার কান্না
আগুনের লেলিহান জিহ্বা
গিলে খাচ্ছে একের পর ভালবাসার নীড়
আমার বোনের গগনভেদী চিৎকার, 'বাঁচাও বাঁচাও'
অক্ষম আমি, আজও বাঁচাতে পারলাম না ওদের।

আর কত, আর কত যাবে প্রাণ
পুড়ে ছাই হবে স্বপ্ন,
লুণ্ঠিত হবে আর কত মা-বোনের সম্ভ্রম
চৌদ্দপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে
ভিনদেশে বইবে উদ্বাস্তু স্রোত ?
আর কত, আর কত ?
ঈশ্বর, এবার ওদের তুমি সুমতি দাও
বিদ্বেষের মাটিতে উঁকি মারুক নতুন চারা গাছ
ফুলে-ফুলে ভরে উঠুক রক্তাক্ত মাটি
সুগন্ধে চাপা পড়ে যাক সব দুর্গন্ধ ।



রেখাচিত্র – শৈলেন পাত্র

# গ ল্প মা লা ২

---

**নদীর এপার * অনুপকুমার আচার্য**

জিনি আবার ফিরে এল এ-ঘরে। আচমকা। ঘরের তিনটি প্রাণীই কমবেশি অপ্রস্তুত। বাসু মিলি তো বটেই। সুগতও। বাসু কথা বলছিল। শেষ হল না।

এবার জিনি একা। একটু আগে তার সঙ্গে মেয়ে ছিল। বছর পাঁচেক বয়েস। মা-র চেয়ে দিদার ন্যাওটা বেশি। জিনি তাকে কোথায় রেখে এল ?

সুগত জিনিকে দেখল। থমথমে মুখ। চোখের তারায় অবিশ্বাসের ছায়ার মতো আটকে আছে কিছু।

- কি রে, কিছু বলবি ? সুগত নরম গলায় জিজ্ঞেস করল। বাসু মিলি মেয়ের বেমক্কা আচরণে এখনও টাল সামলাতে ব্যস্ত। এতক্ষণ সবার সঙ্গে কাটিয়ে বিদায়ের পর এভাবে ফিরে আসার মানেটা কী !

জিনি কথা বলল না। সুগতকে দেখল শুধু। মা-বাবাকে আড়চোখে দেখল কি না --- বোঝা গেল না।

সুগত এসেছে অনেকক্ষণ। বিকেলের মুখে। এখন সন্ধ্যে ঘনাতে শুরু করেছে বাইরে। উৎসাহী দু'এক বাড়ি থেকে শাঁখের ফুঁ কানে এল।

তিন যুগ আগে সুগত আর বাসুদেব একটি সরকারী ব্যাঙ্কের সদর কার্যালয়ে কেরানির তকমা এঁটে ঢুকেছিল। একদিনে। জীবন শুরুর এই মিলটুকু নেহাত কাকতালীয়। দীর্ঘ চাকরিক্ষেত্রের দিনগুলোয় ভিন্ন খাতে জীবন বয়ে গেছে। প্রমোশনের সুবাদে বাসু বারদুয়েক ভিনরাজ্যের জলহাওয়ায় শক্ত সমর্থ হয়েছে। সুগতর সেসব হয়ে ওঠেনি। অশক্ত বাবা-মা আর চিররুগ্ন স্ত্রীর মায়াজালে আটকে হাঁসফাঁস জীবন কেটেছে। তবু, জীবিকা-সঙ্গ নি:সঙ্গ করেনি কাউকে। দূরান্তের জীবন, পদবৈষম্যের ভ্রুকুটি সত্ত্বেও। বরং সখ্য আরও নিবিড় হয়েছে। ঘনিষ্ঠতা দুই পরিবারের চার দেয়ালে আশ্রয় পেয়েছে। নিশ্চিত নিরাপদ। নির্ভার।

নিজেদের বিয়ে-থা, সন্তানের জন্ম, বাড়িঘর তৈরির অভিজ্ঞতায় আরও মজবুত হয়েছে নির্ভরতা। শক্তপোক্ত। একে অন্যের সুখ-দু:খের হাল-হকিকতের আলোছায়ায় বিশ্বস্ত কেটে গেল এতকাল।

জিনি বারকয়েক ঘরময় ঘুরপাক খেল। নির্বাক। তারপর থিতু হল সোফার কোণে। কিছু আগেও যেখানে সময় কাটিয়ে গেছে অনেকটা। মেয়েকে নিয়ে। জিনির মেয়ে মা-র চেয়ে সুন্দরী হবে। কথাবার্তায় চৌকস এখনই। বুদ্ধিদীপ্ত। দাদু-দিদার সুখ সুবিধের দিকে তীক্ষ্ণ নজর। এখানকার স্কুলেই যাতায়াত শুরু করেছে।

বাসু ঘরের পরিস্থিতি মাপতে চাইছিল। একসময় ফিরল নিজের অসমাপ্ত কথায়। --- হিরণ ভাল ছেলে। আমি তাকে দোষ দিই না। নিয়মিত না হলেও, মাঝে মাঝে আসে। বড় মেয়েকে নিয়েও কখনও। বউ-মেয়েকে দেখে যায়। টাকা পয়সাও দেয় না, এমন নয়।

বলা কথা। আগেও বলেছে বাসু। তার এসব কথায় মুখ খোলেনি জিনি। একটু আগেও। এখনও মুখ নীচু করে বসে থাকল। প্রতিক্রিয়াহীন। --- ওদের নিয়েও যায় মাঝেমধ্যে। জিনিকে এক ঝলক দেখে কথা বলছিল বাসু। --- ওই থাকতে চায় না।

দু'দিন যেতে না যেতেই ফিরে আসে। কাটা কাটা কথা শেষ করল। এখনও জিনির মুখে কথা নেই। মাথা নীচু করে শুনছে ।

বুড়ো মা-বাপ আর মেয়েটাকে নিয়ে আধখ্যাঁচড়া জীবন ! মেয়ে-জামাইয়ের সংসারের কথা বলছিল বাসু। সুগতর অজানা নয় কিছু। অবসর-জীবনে বিবাহিতা মেয়ের এহেন উপস্থিতি মাথাব্যথার কারণ বৈকি ! ইদানীং মোবাইলের কথাবার্তায় এসবই জুড়ে থাকে অনেক সময়।

একমাত্র মেয়ে বাসুর। পড়াশুনোয় মন্দ ছিল না। তবু সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে গেল কেন, কে জানে ! জিনিকে নতুন করে দেখল সুগত। ভূমিষ্ঠ হলে তার সন্তানও জিনির বয়েসী হত। মিলির সঙ্গেই প্রায় এক সময়ে কনসিভ করেছিল দেবিকা। সাত মাসের মাথায় বাথরুমে পড়ে...। দু'দিন যমে মানুষে টানাটানি করে সে বাড়ি ফিরল। গর্ভস্থ ভ্রুণটিকে ছাড়া। সাত দিন পরে অফিসে জয়েন করে সুগত শুনল, বাসু মেয়ের বাবা হয়েছে। খুশিতে ঝলমলে দেখাচ্ছিল তাকে।

সুগত যতটা সম্ভব বাসুর আনন্দে সামিল হবার চেষ্টা করল। বাসু তার কাঁধে সান্ত্বনার হাত রাখল। জ়িনি মুখ গোঁজ করে বসে আছে। কত বয়েস হল জিনির ? পৃথিবীর আলো দেখলে তাদের সন্তানও ...। ছেলে ছিল না মেয়ে... কে জানে !

মেয়ের বিয়ের সময় বাসুর জোরাজুরিতে রাজি হয়েছিল সুগত। অফিসে দু'দিন ছুটি নিয়ে বন্ধুর বাড়িতে ছিল সে। ভালমন্দ সব মিলিয়ে উতরে দিয়েছিল বাসুকে। বাসুর কথায় অবাক হয়েছিল ঠিকই। বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে কারণ খোঁজেনি সেদিন। বিয়ের দিন ব্যস্তই ছিল সে। জিনির হবু শ্বশুর বাড়িতেও যেতে হল। আশীর্বাদ পর্ব সেরে বরকে বিয়ের আসরে নিয়ে আসার জন্যে।

সেই প্রথম হিরণকে দেখা। বাসুর জামাই। পরেও বারদুয়েক দেখেছে তাকে। ভদ্র, মার্জিত। উড়নচণ্ডী গোছের কিছু নয়। দায়িত্বজ্ঞানহীন --- মনে হয়নি কখনও। জিনির শ্বশুর-শাশুড়িকেও খারাপ লাগেনি তেমন। একদিনের দেখায়।

--- হিরণ আসলে --- বাসু জামাইয়ের কথা বলতে চাইছিল সম্ভবত। দীর্ঘ নীরবতার পর। আর ঠিক তখনই অভাবিত ঘটনা। চমকে দেবার মতো। অপ্রস্তুতের একশেষ।

সোফা ছেড়ে উঠে চিৎকার করে উঠল জিনি। হঠাৎই -- সারাদিন শুধু হিরণ আর হিরণ ! আমি আর যাব না ওই বাড়ি। আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়েছিলে তোমরা !

ঘরময় পায়চারি করতে করতে জিনি কথা বলছিল। সজোরে। চোখমুখ বিস্ফারিত। আগুন ঝলসাচ্ছে যেন। জন্ম থেকে দেখে আসা এই জিনিকে চেনে না সুগত। একটু সরল বোকাসোকা হলেও, মিষ্টি মেয়েটার এই রূপ একেবারে অচেনা।

অশান্ত জিনি দাঁড়িয়ে নেই কোথাও। এদিক ওদিক করতে করতে বলে যাচ্ছে --- সব ক'টা শয়তান ! শাশুড়িটা একটা রাক্ষুসী। ননদগুলোও তাই। সব একজোট। আমি আর হিরণের কাছে শোব না ! কার দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করল জিনি ?

ঘরে পিন পতনের শব্দ। হতবাক সবাই। মাথা নীচু করে বসে আছে বাসু আর মিলি। সুগত কি বলবে --- হদিস পেল না কিছু। বেমক্কা ঘরের পরিবেশ বদলে গেছে। কয়েক মিনিটের ঝড়ের তাণ্ডবের মতো। সব তছনছ। কেউ কারও দিকে তাকিয়ে নেই। থমথমে আবহে এক সময় আবিষ্কার করল সুগত -- ঘরে জিনি নেই। যেন নিরীহ শান্তিকামী দেশে বিনা প্ররোচনায় গোলাবর্ষণ করে গেছে কেউ। অস্বস্তি কাটাতে উঠে পড়ল সুগত। - অনেকক্ষণ এসেছি। উঠতে হয় এবার। অনেকটা দূর -

বাসু সুগত এক সময় স্বপ্ন দেখেছিল, এক জায়গায় বাড়ি করবে দু'জন। পাশাপাশি থাকবে। হয়নি। বাসু পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে এলেও জন্মস্থান ত্যাগ করতে চায়নি। গঙ্গার পূব-পশ্চিমের দু'পারে নিজেদের চেনা বাসভূমেই কেটে যাচ্ছে জীবন।

বাড়ির কাছেই স্টেশন। বন্ধুকে এগিয়ে দিতে আসছিল বাসু। রাস্তায় নেমে বাধা দিল সুগত।

- তোকে আসতে হবে না। নতুন তো নয়। মিলি একা আছে।

ছুটির দিন। সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কামরায় লোকজন কম। জিনির বিয়ের দিনের কথা মনে পড়ল। বিয়ের আনুষ্ঠানিক কাজকর্মের মধ্যেই হঠাৎ অস্থিরতা একটা। চাপা উত্তেজনা, আত্মীয়স্বজনের ব্যস্ততা। ছুটোছুটি। সুগত হতবাক। কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না।

মিলির মাকে নিয়ে টানাটানি। টের পেল, এক সময় মনোরোগের শিকার বৃদ্ধার আচরণে কিছু গরমিল ধরা পড়ে থাকবে হয়তো। তাঁকে দরজা-বন্ধ ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। বাইরে থেকে তাঁর চিৎকার শোনা যাচ্ছিল।

এরই মধ্যে পুরোহিতের সামনে জিনির জ্ঞান হারানোর ঘটনা। তাকে নিয়ে আরেক দফা ব্যস্ততা। স্বজন-পরিজনের উদ্বেগ। নানারকম কথা। মতামত। পরামর্শ। অভাবিত এক পরিস্থিতিতে আটকে থাকা ছাড়া সুগতর কিছু করার ছিল না। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা যাচ্ছে না। সকলেই কোন না কোন দিক সামলাতে ব্যস্ত।

চোখমুখে জল ছিটিয়ে জিনিকে সুস্থ করা গেল। স্বাভাবিক --- অল্প সময়ের মধ্যেই। কিছুটা স্বস্তি ফিরল বাড়ির লোকজনের। বাসু খানিক ধাতস্থ। মিলিকে অবশ্যি ধারে কাছে দেখা গেল না। সম্ভবত মা-র বদ্ধ ঘরে আটকে ছিল সে।

পুরনো কথার ভিড়ে ট্রেনের যাত্রাপথ ফুরিয়ে এল প্রায়। একটু দ্রুতই হয়তো। সুগত দরজার দিকে এগোল। ট্রেন হাওড়ায় ঢুকছে।

- নারানদা আজও এলেন না কিন্তু ! দীর্ঘ নীরবতার পর শুভ মুখ খুলল। বাকি দু'জনকে দেখল।

মফসসলের প্রান্তিক স্টেশন। দু'মুখো সিমেন্টের বেঞ্চে বিকেলের আড্ডা। শুভর কথার জবাবে প্রদোষ বলল --- শরীর-টরীর বিগড়েছে বোধ হয়।

সুগত দু'জনের কথাই শুনল। কিছু বলল না।

বছর পাঁচেকের মধ্যে চাকরির জোয়াল-মুক্ত চারজন মানুষ। শুভ রিটায়ার করেছে বছরখানেকও হয়নি। সে হিসেবে বাকিদের জুনিয়র। নারান ওরফে নারায়ণ দত্ত সিনিয়র মোস্ট। প্রদোষ সুগত প্রায় একসঙ্গে চাকরি ছেড়েছে।

সুগত নারানকে চেনে অনেকদিন। তল্লাটের পুরনো লোক। স্থানীয় বাসিন্দা। তাদের মতো নতুন বাড়ি করে আসা উটকো পাবলিক নয়।

শেয়ালদা থেকে পৌনে ছ'টার লোকাল এল। ফিরেও গেল ছ'টার আপ ট্রেন হয়ে। প্ল্যাটফর্মে আপাতত তাদের মতো অবসরভোগী মানুষের জটলা। দিনদিন বাড়ছে।

নারানের সঙ্গে তার পরিচয় অন্যদের চেয়ে পুরনো। বাড়ি তৈরির সময় হার্ডওয়ারের দোকানে। এলাকার দোকানীকে কিছু জিনিসপত্র ফরমাশ করার সময় পাশ থেকে একজন বলে উঠেছিল - ছাদ ঢালাই হচ্ছে বুঝি ! চোখ ফিরিয়ে বক্তাকে দেখেছিল সুগত। ঠোঁটে আলগা হাসি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল নারান।

আলটপকা কথা বলেও নারান এগিয়ে এসেছিল সুগতর দিকে। অভিজ্ঞ চোখমুখে আত্মবিশ্বাসের হাসি। কথার মতোই আগ বাড়িয়ে বাড়িঘর তৈরির কিছু পরামর্শ দিয়েছিল সুগতকে। অযাচিত। সুগত বিরক্ত হয়নি। আনপড় বোধবুদ্ধি নিয়ে শুনেছিল নারানের কথা। তারপর থেকে রাস্তাঘাট হাটবাজারে দেখা হতে থাকল দু'জনের। ছোট জায়গা। প্রথমে মাথা নেড়ে সম্মতির হাসি। তারপর সামান্য কথা। মামুলি। ক্রমশ দানা বাঁধল পরিচয় পর্ব। শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্বের জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গেল ব্যাপারটা। নতুন জায়গা বলে চেনামুখ কম। দেখা হলেই সোৎসাহে কথা বলে নারান। এটা ওটা জিজ্ঞেস করে। বাড়ি কতদূর এগোল। সংসারে লোকজন ক'জন। পোশাকী হলেও কথাবার্তায় আন্তরিকতা টের পাওয়া যায়। সুগতর ভাল লেগে গেল।

ছ'টার ট্রেন বেরিয়ে যাবার পর নারান আড্ডায় আসে। আগে কিছুতেই নয়। কেন, কে জানে! ততক্ষণে স্টেশনে এসে যায়

অন্যরা। গত ক'দিন নারান আসছে না। শুভ না বললেও মাথায় আছে সুগতর। তার ছোট পরিবারের ফোকরেও অশান্তির কীট ঢুকেছে। কালস্য কুটিলা গতি। এক পাড়ার বাসিন্দা না হলেও, নারানের বাড়ি খুব দূরেও নয়। মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার দু'টো গলি পেরিয়ে। রাস্তার নামও আলাদা। স্টেশনের কাছাকাছি পুরনো বনেদি পাড়ায় তার বাস। কাছে হলেও, স্টেশনের ধার ধারতে হয়নি নারানকে নিত্যদিন। সে স্থানীয় তেল কোম্পানির মহার্ঘ্য চাকুরে ছিল। পদস্থ আধিকারিক।

রিটায়ারের পর সকলের মতো নারান সকাল সন্ধ্যে বাড়ির বাইরে বেরোনোর অভ্যেসে থিতু হল। সকালে হাঁটা। বিকেল আড্ডা। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। রাস্তায় একদিন দেখা হতেই নারান পাকড়াও করল তাকে। সবে রিটায়ার করেছে সুগত। --- কি করেন সারাদিন ! আমার তো সময় কাটে না...

দু'চার কথার পর সুগতকে টেনে আনল বিকেলের ঠেকে। স্টেশনে। নারানের একাকীত্ব ঘুচল। সাড়ে ছ'টার ট্রেন ঢুকল। ভিড় কেটে গেলে প্রদোষ বলল --- নারানের ছেলে ফিরল। আমিও দেখলাম। ছটফট করে উঠল শুভ। একমাত্র ছেলের বিয়েতে নারান নেমন্তন্ন করেছিল। দেবিকাকে নিয়ে গিয়েছিল সুগত। পুরনো আমলের বাড়িকে হালের চেহারায় সাজিয়ে নিয়েছে সে। তার জ্ঞানগম্যি রুচিবোধের প্রশংসা না করে উপায় নেই। পেল্লায় ঘরদোর। ফাঁকা জমি-জিরেতও কম নয়।

বছরখানেক আগে নাতির অন্নপ্রাশনেও সবান্ধব খেয়ে এল সুগতরা। বাইরে থেকে সব ঠিকঠাক। ছবির মতো সংসার। নিজেরা দু'জন। খাওয়াদাওয়ার পর বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। শুভর জন্যে অপেক্ষা। বাড়ির লোকজনের সঙ্গে গল্পে মেতেছে সে।

সুগতর পাশে নারানের পড়শি। খাবার টেবিলের শরিক। মুখোমুখি খেতে বসে আলাপ। কথাবার্তা।

নারানবাবু ভালই ছিলেন। এখন আর নেই। নিরীহ সাদামাটা ভদ্রলোকের কাছে শোনা। এই প্রথম। সুগত অন্যমনস্ক ছিল। হঠাৎ এরকম কথায় মনোযোগী না হয়ে উপায় নেই। ছেলে-বৌমা নারানের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠছে। ঘরবাড়ি জমি-জায়গায় নিজেদের অধিকার কায়েম করে নিতে চাইছে ইদানীং। অশান্তি শুরু হয়েছ নাতি হবার পর। ভদ্রলোকের কথায় মারপ্যাঁচ নেই। সোজাসাপটা উঠে আসছিল নারানের হাল-হকিকৎ। সুগত হাঁ হয়ে গিয়েছিল। এতদিন নারানের সঙ্গে ওঠাবসা। আড্ডায় সময় কাটছে নিয়মিত। টের পায়নি কখনও।

নারানের সঙ্গে পরিচয় আজকের নয়। বংশ গরিমা শিক্ষাদীক্ষা বিষয়-আশয় --- কোনদিকেই খামতি নেই কিছু। এতসব নিয়েও মানুষটা সৎ। নির্ভেজাল। অকারণ-জটিলতা মুক্ত। নিজের সম্পর্কে মুখর নয় কখনও। চাপা স্বভাবের বরং। তাকে বিলক্ষণ চেনে সুগত। পড়শি ভদ্রলোকের কাছে শোনার পর একদিনের ঘটনা। সন্তানের কাছে বয়স্ক মানুষজনের অপমান নির্যাতন নতুন কিছু নয়। সম্ভবত সেদিনের কাগজে ছাপা একটি খবর সরবে বলছিল শুভ। নারান শুনছিল। নির্বিকার।
ভাবলেশহীন। অন্তত মুখের রেখায় হাবভাবে তার কোন ছবিই ছিল না নারানের। সুগতর স্পষ্ট মনে আছে নারানের নিস্পৃহ চেহারা। ভাঙবে তবু মচকাবে না ! এই তো গত সপ্তা'র ব্যাপার। ক'দিন গরহাজিরের পর নারান এল। চোখের নীচে কালশিটের দাগ নিয়ে। সুগত লক্ষ্য করেনি। প্রদোষের নজর পড়ল। জিজ্ঞেস করতে চটপট উত্তর এল - বাথরুমে পড়ে গেলাম একদিন। শুভ সুগত দেখল নারানকে। পুরনো হয়ে এসেছে দাগটা। একেবারে টাটকা নয়। আহতের এমন কথায় কার কী বলার থাকে ! নারানকে নিয়ে হালফিল কথা হয় বৈকি ! তাতে কৌতূহল থাকে। চাপা উদ্বেগও। নারানের ছেলেকে সুগত চেনে না - এমন নয়। প্রায় রোজ চোখের সামনে অফিস-ফেরত ট্রেন থেকে নামে। ভিড়ের মধ্যেও চোখে পড়ে কখনও। নারানের বাড়িতেও মুখোমুখি হয়েছে। একটু লাজুক শান্ত গোছের। মিনমিনে টাইপ। কিছুটা নারানের মতো। সবটা নয়।

শীতের সন্ধ্যে। বুড়োটে চেহারা নেয় দ্রুত। আটটাকে গভীর রাত দেখায়।

- আমার মনে হয়, নারানদার একটা খোঁজ নেওয়া দরকার। শুভ উঠতে উঠতে বলল। প্রদোষ মাথা নাড়ল। সুগত জানে, শুভর ইঙ্গিত তার দিকেই। ঘুরপথ হলেও, বাড়িমুখো নারানের ডেরা তার পক্ষে সুবিধের। অনেকদিন পর এ গলিতে ঢুকল সুগত। এখন সব কিছুই দ্রুত বদলে যায়। এ পাড়ার চেহারাও বদলেছে। নতুন বাড়ি হয়েছে কিছু। ঝাঁ চকচকে। রাস্তার আলোর দৈন্যদশাও কেটেছে।

নারানের বাড়ির কাছাকাছি এসে হকচকিয়ে গেল সুগত। বাড়ির সামনে জটলা। মানুষজনের কথাবার্তার স্বর। চাপা নয় কিছু। চিৎকার চেঁচামেচির আবহ। ধীর পায়ে এগোতেই ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল নারানের ছেলে। একা নয়। তার কাঁধে থানার ওসির হাত। তার সহকর্মীর মুঠোয় শ্রীমানের শার্টের হাত। গলির মুখে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে। গোড়ায় কাজ করেনি মাথা। এখন টনক নড়ল। সবটা বোঝার আগেই মুখের ওপর দিয়ে নারানের ছেলেকে নিয়ে ভ্যানের দিকে এগোল পুলিশের লোক। সুগতর মুখে কথা ফুটল না। বাইরের ভিড় হালকা হতে শুরু করেছে এবার। তার ভেতর থেকে যা কানে এল, সুগতর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার দশা।

নারানের ছেলে-বৌয়ের অত্যাচার নাকি ইদানীং মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। বাড়িঘর জমি জায়গা সব তাদের নামে লিখে দিতে হবে। তা নিয়ে নিত্য ঝামেলা। বাকবিতণ্ডা চিৎকার গালমন্দ। পাড়ার লোকজনের কাছে আর গোপন নেই তেমন। গায়ে হাত তোলার কথাও শোনাল একজন। চূড়ান্ত অবস্থা নাকি গেছে গতকাল রাতে। নারান আর তার স্ত্রীকে ঘরের বাইরে বার করে দিয়েছে তার ছেলে আর বউ। নি:শব্দে সারারাত স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে কাটিয়েছে নারান। এই শীতেও। সুগত দূর থেকে নারানকে দেখতে পেল না। হয়তো ঘরে প্রবেশাধিকার জুটেছে এখন। সুগতর মনে হল, বাড়ির ভেতরে ঢোকে একবার। মুহূর্তে থমকাল। নারানকে অপ্রস্তুত করে লাভ কী তার !

****

বাড়ির দিকে হাঁটছিল সুগত। মাথায় নারানের কথা। তার মানে গতকাল রাতে নারান ওরফে শ্রী নারায়ণ দত্ত ও তার সহধর্মিণী শ্রীমতী রমা দত্ত তাদের এতকালের বাসভূমের গৃহকোণ থেকে নির্বাসিত হয়েছেন। এবং ঘরের বাইরে রাত্রিযাপন করেছেন !

হঠাৎ বাসুর কথা মনে পড়ল। তবু ভাল। নারান-বাসুর কেউ আছে। তাদের কে আছে !

এক অজাতক বিসর্জনের দু:সহ স্মৃতি নিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে জীবন। সে আর দেবিকা। ছেলে অথবা মেয়ের ভ্রূণ ...। তারপরেও কেউ এল না !

বাড়ির কাছে এসে নি:স্ব সুগতর পুরনো প্রবাদ মনে পড়ল। নীরক্ত হাসি ফুটল ঠোঁটে। এই প্রথম মনে হল --- নদীর ওপার নয়। কখনও এপারই ভাল।

**কামিনী ফুলের গাছ *রবীন বসু**

আজ রবিবার। ছুটির দিন। বিকেলে ব্যালকনিতে এসে বসেছে মৃত্তিকা। এটা ওর বরাবরের অভ্যেস।
চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেই চোখ চলে যায় নিচে, ফ্ল্যাটের বাঁপাশে ঝাঁকড়া কামিনী ফুলের গাছটার দিকে। ছোট ছোট সবুজ পাতায় ঘেরা মাঝারি উচ্চতার চিকন গাছ। শুনেছে ফ্ল্যাট হবার আগে যাদের বাড়ি ছিল, সেই দত্তকাকুর মা গাছটা বসিয়েছিলেন। তলাটা গোল করে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো হয়েছিল লাল রঙে। গরমের দিন বিকেলে এসে বসতেন। পাড়ার অন্যান্য প্রতিবেশী বউ আর তাদের মেয়েরাও এসে বসত। পরস্পর গল্প হত। এ-বাড়ির খবর ও-বাড়ি পেত, ও-বাড়ির খবর এ-বাড়ি। আইবুড়ো মেয়েগুলো চাপাস্বরে নিজেদের প্রেমের গল্প করত। মতান্তর যে হতো না, তা নয়। তবে তাতে আড্ডা থেমে থাকত না।

বর্ষা এলে গাছ থোকা থোকা সাদা ফুলে ভরে যায়। কী মিষ্টি গন্ধ ছড়ায় তখন। সারা পাড়া ম-ম করে সেই গন্ধে। সন্ধেবেলা অফিসফেরতা কেমন ঘোর লাগে। ওপরে এসে তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করে চায়ের কাপ হাতে ব্যালকনিতে এসে বসে মৃত্তিকা। মিষ্টি গন্ধে শরীর মন জুড়িয়ে যায়। কামিনী ফুলের গাছটা কখন যে মৃত্তিকার সত্তার একটা অংশ হয়ে গেছে, তা সে বুঝতেই পারেনি।

রবিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে সে চা করে। তারপর মায়ের ঘরে যায়। সপ্তাহের অন্য দিনগুলো মা চা নিয়ে তার ঘুম ভাঙায়। ব্যতিক্রম শুধু এই রবিবার। মৃত্তিকাই মাকে বলেছিল, "সারা সপ্তাহ খাটো, তাই রবিবার তোমার ছুটি। কোনো কাজে হাত দেবে না।"

অরুন্ধতী বলেছিল, "তা কী হয় ! তুইও তো সারা সপ্তাহ ধরে অফিসে খাটিস।"

শেষে একটা রফা হয়। সরমা মাসিকে সাথে নিয়ে মা শুধু রান্নার তদারকি করবে। ঘর ঝাড়ামোছা, মাসিক বাজার, গ্যাস বুক করা, ইলেকট্রিক বিল পেমেন্ট সব মৃত্তিকার দায়িত্ব। কোন ছোটবেলায় বাবা মারা গেছে। বাবার অফিসে মা চাকরি পায়। তারপর মা-মেয়ের একা লড়াই। মৃত্তিকা একসময় চাকরি পায়। মা অবসর নেয়। ভাড়া বাড়ি ছেড়ে তারা দক্ষিণ কলকাতায় এই থ্রি-বিএইচকে ফ্ল্যাটে উঠে আসে। মায়ের সঙ্গে ফ্ল্যাট দেখতে এসে তার প্রথম পছন্দ হয় মাঝারি উচ্চতার এই কামিনী ফুলের গাছটা। ফ্ল্যাটে ঢোকার মুখে। তখন জুলাই মাস। গাছ ফুলে ভরা ছিল। গন্ধেও। ভাল লাগে মৃত্তিকার। মায়ের হাতে চাপ দিয়ে বলেছিল, "প্লিজ মা, তুমি এই ফ্ল্যাটটা পছন্দ কোরো।"

আসলে ছোটবেলা থেকে গাছ ভালবাসে মৃত্তিকা। আর ফুলগাছ হলে তো কথাই নেই। তাই মা যখন ফ্ল্যাট পছন্দ করল, তখন সে প্রোমোটারকে বলে, "আমাদের বাঁপাশের কামিনী ফুলের গাছের দিকে এই সেকেণ্ড ফ্লোরটা দিন। যাতে ব্যালকনিতে বসে আমি ফুলগাছটাকে দেখতে পাই।"

প্রোমোটার হাসিমুখে কথা দিয়ে ছিল, "ঠিক আছে। তাই হবে। এই ফ্ল্যাটটাই আপনাদের নামে অ্যালট করে দিচ্ছি।"

বর্ষা আসতে বিলম্ব আছে। সবে মার্চ মাস। কামিনী গাছে ফুলের জন্য এখনও প্রায় তিন মাস অপেক্ষা করতে হবে। সকালে মিটিংয়ের পর তার মনটা খুব খারাপ। মাথাটা তাই এখনও ঝাঁ-ঝাঁ করছে। প্রতি মাসে সম্ভব হয় না, তাই তিন মাস অন্তর তাদের ফ্ল্যাটে যে আবাসিক কল্যাণ সমিতি আছে, তার সভা ছিল। সেখানে অন্যান্য জরুরি আলোচনার শেষে ফার্স্ট ফ্লোরের মিত্রবাবু একটা অন্য প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁর বেডরুমের বাঁপাশেই ওই কামিনী ফুলের গাছটা। এতদিন তিনি দু'একটা ডাল কেটে দিতেন শীতকালে। তখন নাকি ওঁনার ঘরে রোদ ঢোকে না। কিন্তু এবার ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস। ওঁনার বড়মেয়ে যার ব্যাঙ্গালোরে বিয়ে হয়েছে, সে প্রথমবার মা হতে চলেছে। সামনের মাস থেকে এখান এসে থাকবে প্রায় বছরখানেক। তাই মা এবং আগামী

শিশুর ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের কথা ভেবে তাঁরা চান, ওই কামিনী ফুলের গাছটা কেটে দেওয়া হোক। রোদ আড়াল তো হয়ই, তার উপর পোকা- মাকড় ও মশার উৎপাত। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, চারপাশে যা ভাইরাসের আক্রমণ। তাই সাবধান হতে হবে।  না-হলে মা ও শিশুর বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

অনেকে মাথা নাড়লেন। মৃত্তিকা চেঁচিয়ে উঠল, "গাছ কাটা যাবে না। আপনারা তো সবাই জানেন, গাছ কাটা এখন নিষেধ। তাছাড়া আমাদের এই কমপ্লেক্সে ওই একটাই ফুলের গাছ। আপনারা অন্য ভাবে ব্যাপারটা ভাবুন।"

মিত্রবাবু এবার ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "বলি, কী ভাবব ! শিশুর জীবন বড়, না ফুলের সৌন্দর্য।"

মৃত্তিকা বলে, "শিশুর স্বাস্থ্য তো আগে কাকাবাবু। তবে একটা ফুলের গাছ কেটে তো আপনি সব ভাইরাসকে তাড়াতে পারবেন না দেশ থেকে। আর পোকামাকড় ও মশার কথা হলে বলি, জানলায় সবাই তো আজকাল ঘন নেট লাগাচ্ছে। আপনারা লাগান। তাছাড়া এসি রুমে এমনিতে তো জানলা বন্ধ থাকে।"

মৃত্তিকার কথায় সবাই যুক্তি খুঁজে পায়। শেষমেশ সিদ্ধান্ত হল আপাতত মিত্রবাবুর বেডরুমের দিকে জানলার ধারঘেঁষা কয়েকটা ডাল কেটে দেওয়া হবে। গাছ কাটা চলবে না।

এখন ব্যালকনিতে বসে সকালের কথাটা ভাবছিল মৃত্তিকা। মিত্রবাবুর থমথমে ক্রুদ্ধ মুখটা বার বার মনে পড়ছে। রেগেমেগে নেমে এলেন নিচে ঠিকই, কিন্তু ব্যাপারটা কী সহজে মিটবে ! মৃত্তিকার মনে দুশ্চিন্তা। সে কামিনী গাছের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে।

ব্যালকনির টবে বসানো বেল-মল্লিকাতে সবে কুঁড়ি এসেছে। দু'একটার মুখ ফুটেছে। মৃদু গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। বেল-মল্লিকার গন্ধ আর বসন্তসন্ধ্যার বাতাস তার মনকে অনেকটা শান্ত করল। এমন সময় সরলামাসি চা দিয়ে গেল। চায়ের কাপে চুমুক দিতেই ফোন বেজে উঠল। ধরতেই ওপারে অর্কর গলা। "কী ব্যাপার ! সকালে কতবার ফোন করলুম। ধরলি না। হোয়াটসঅ্যাপ দেখলি না। কী হল তোর ?"

"কিচ্ছু না। আসলে সকালে একটা মিটিং ছিল। ফোন অফ রেখেছিলাম। বল, কী হয়েছে ?'

"কী হবে আবার। দু' সপ্তাহ তোকে দেখিনি। গত রবিবার বের হতে বললুম, এলি না।"

"তোকে তো বলেছিলাম, মাকে নিয়ে চোখ দেখাতে যাব। পাওয়ারটা বেড়েছে। মাথায় যন্ত্রণা হয়।"

"বেশ বুঝলুম। কিন্তু আজ আয়। হপিপোলাতে দেখা হোক। মাইরি বলছি, তোকে দেখতে না পেলে মেজাজ খুব খারাপ হয়ে যায়। প্লিজ আয়।"

"আজ হবে না। আমার মনটা ভাল নেই। তাছাড়া এখন অনেক বেজে গেছে।"

"বেশি বাজেনি। সবে সাড়ে ছ'টা। আমি বাইকে পৌঁছে দেব। না এলে কিন্তু রাগ করব খুব। তুই আয় ।" অর্ক আকুল হয়।

মৃত্তিকার সত্যি আজ বের হতে ভাল লাগছে না। সে কী করে বোঝাবে অর্ককে। কামিনী গাছটাকে ঘিরে তার মনে বেশ উদ্বেগ। কয়েকটা ডাল কাটার ব্যাপার তো নয় ! কী যে ঘটবে সে বুঝতে পারছে না। গাছটার দিকে একবার তাকিয়ে শেষে অর্ককে বলে, "সরি, আজ হবে না। সামনের রোববার ঠিক যাব।"

অর্ক বিরক্ত হয়ে ফোন বন্ধ করে দেয়।

সেদিন রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল মৃত্তিকা। সারি সারি কামিনী ফুলের গাছ। সে পাগলের মতো দৌড়চ্ছে আর এক একটা গাছকে জড়িয়ে ধরে বলছে, "তোদের কাটতে দেব না। কিছুতেই না।" তাকে দেখে শহরের অন্য মেয়েরাও এগিয়ে এসে গাছকে জড়িয়ে ধরছে। আর দূরে ধারালো কুড়ুল হাতে মিত্রবাবু দাঁড়িয়ে।

যখন ঘুম ভাঙল, দেখে তার গা ঘেমে গেছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। উঠে টেবিল থেকে জলের বোতল নিয়ে জল খায়। আসলে

শুতে যাবার আগে সে নেট সার্চ করেছিল। বৃক্ষছেদনের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়। পরিবেশ আন্দোলন পড়তে গিয়ে তার নজরে আসে ‘চিপকো আন্দোলন’-এর কথা। স্বাধীন ভারতে প্রথম পরিবেশ বা বনভূমি সংরক্ষণ আন্দোলনের নাম ‘চিপকো’। এই আন্দোলনের পিছনের প্রেরণা হিসেবে দেখা হয় ১৭৬৩ সালে রাজস্থানের বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের মানুষ, বিশেষ করে গ্রামের মহিলারা তাদের প্রাণের প্রিয় খেজরি গাছকে জড়িয়ে ধরে তাকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিল। 'চিপকো' কথার অর্থ ‘আলিঙ্গন’। গাছকে আলিঙ্গন করে, তাকে ছেদন থেকে বাঁচানোই চিপকো আন্দোলন। স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে হিমালয় গাড়োয়াল পার্বত্য অঞ্চলের অমূল্য অরণ্য-সম্পদকে রক্ষা করার জন্য ১৯৭৩-এ দাশোলি গ্রাম স্বরাজ্য সংঘ-এর নেতা চণ্ডী প্রসাদ ভাটের নেতৃত্বে চিপকো আন্দোলন ব্যাপক আকার নেয় ও আস্তে-আস্তে উত্তরাখণ্ড ও অন্যান্য পার্বত্য জেলা রেনি তেহরি কুমায়ুন বৈদ্যগড় সহ সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলস্বরূপ সরকার যথেচ্ছ বৃক্ষছেদন বিরুদ্ধে আইন আনতে বাধ্য হয়।

মৃত্তিকা ভাবল, স্বপ্নটা হয়তো ওই নেটে পড়া চিপকো আন্দোলনের ফল। তবু সে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়, কামিনী ফুলের গাছটাকে রক্ষা করতেই হবে।

সপ্তাহের শেষে একদিন অফিস থেকে ফেরার পথে একটা ক্যাফেতে বসছিল সে আর অর্ক। কথার মাঝে হঠাৎ সে অর্কর কাছে জানতে চায়, পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কোনো ব্যক্তিকে সে চেনে কিনা। কারণ জানতে চাইলে, মৃত্তিকা সব ঘটনা খুলে বলে। তখন অর্ক বলে, "আচ্ছা, আমি খবর নেব। সন্ধান পেলে তোকে জানাব।"

"তাড়াতাড়ি কিন্তু !" অস্থির হয় মৃত্তিকা।

"ঠিক আছে বাবা। আমি খুঁজে দেব। এখন কফি তো খা।"

এর কিছুদিন পর মৃত্তিকার নজরে পড়ল, কামিনী ফুলের গাছটার পাতাগুলো কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। সে দৌড়ে নিচে নেমে গিয়ে দেখে গোল করে বাঁধানো গাছের গোড়ার মাটি যেন কিছু দিয়ে খোঁড়া হয়েছে। আর মাটি থেকে একটা ঝাঁঝালো গন্ধ আসছে। মৃত্তিকার বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে। একটা অজানা ভয় তাকে জড়িয়ে ধরে। সে কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর দৌড়ে উপরে এসে অর্ককে ফোন করে। "কিরে ! তোকে যে খবর নিতে বলেছিলুম, পরিবেশরক্ষা নিয়ে কাজ করে এমন কোনো সংস্থা বা এনজিও, তার কী হল ?"

"নিয়েছি। একটা সন্ধানও পেয়েছি। ফোন-নম্বর আর অ্যাড্রেস পেলেই তোকে জানাব।"

"তাহলে, অ্যাড্রেস পেলেই আমাকে একদিন নিয়ে যাবি ওখানে।" মৃত্তিকা অস্থির।

এর দু'দিন পর গোলপার্কের একটা এনজিওতে তাকে নিয়ে যায় অর্ক। সব শোনার পর সেক্রেটারি মিসেস চৌধুরী বলেন, "মনে হচ্ছে গাছের গোড়াতে অ্যাসিড দিয়েছে কেউ। এবং তা পরিমাণে খুব বেশি। শিক্ষিত মানুষেরা গাছকে রক্ষা করার বদলে যদি এমন অবিবেচনা ও গর্হিত অপরাধ করে, তাহলে আমরা পরিবেশকে রক্ষা করব কেমন করে ? আইন আছে কিন্তু প্রমাণ হবে কীভাবে যে ওই মিত্রবাবুই অ্যাসিড ঢেলেছেন ? এই তো কত কেস পেন্ডিং পড়ে আছে, হিয়ারিংই হচ্ছে না।" আপশোসের সুর।

"তাহলে আমি এখন কী করব ?" মৃত্তিকা উদ্বিগ্ন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন মিসেস চৌধুরী। "আচ্ছা, আপনারা ঠিকানা ফোন নম্বর দিয়ে যান। সামনের রবিবার আমাদের এখান থেকে লোক যাবে। তারা সরেজমিনে দেখে এসে রিপোর্ট দিলে আমরা জানাব কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়।"

রবিবার এসে গেল। সকাল এগারোটায় এনজিও থেকে দু'জন ভদ্রলোক এলেন। তাঁদের একজন উদ্ভিদ-বিশেষজ্ঞ আর অন্য জন সয়েল। নিচে নামতেই মৃত্তিকার চোখ ফেটে জল এল। এই ক'দিনেই গাছটার হাল আরও খারাপ হয়েছে। সব পাতা শুকিয়ে বিবর্ণ। ডালপালাগুলোও শুকিয়ে কালো। বিশেষজ্ঞ দু'জন ভালো করে গাছ এবং মাটি পরীক্ষা করে বললেন, "এই দেখুন,

গাছের গোড়ার দিকের বাকলের বেশ কিছুটা গভীর করে কেটে দেওয়া হয়েছে। পাতা ঢেকে থাকায় বুঝতে পারেননি। এইভাবে গাছের বাকল কেটে দিলে গাছ খাদ্য তৈরি ও সরবরাহ করতে পারে না। তখন খাদ্যের অভাবে ধীরে ধীরে শুকিয়ে মরে যায়। সেটাই হয়েছে। আর মাটি পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে, মাটি খুঁড়ে গভীর করে শিকড়ে এসিড ঢালা হয়েছে মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে।"

"গাছটাকে কি কোনো ভাবেই বাঁচানো যাবে না ?"

"দেরি হয়ে গেছে, ম্যাডাম। আর সম্ভব না।" একজন বিশেষজ্ঞ বললেন।

ব্যথাতুর অসহায় মৃত্তিকা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। ততক্ষণে ফ্ল্যাটের অন্য বাসিন্দারা নিচে জড়ো হয়েছে। মিত্রবাবুদের ফ্ল্যাট আজ তিন-চার দিন তালাবন্ধ। তাঁরা নাকি মেয়েকে আনতে ব্যাঙ্গালোর গেছেন। সহবাসিন্দাদের দেখে মৃত্তিকা চিৎকার করে উঠল, "দেখুন, আপনারা দেখুন ! একটা সুন্দর ফুলের গাছকে কেমন নিষ্ঠুর ভাবে এসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিল। ওরও তো প্রাণ ছিল। যে নবজাতক শিশু আসছে, তারও তো অক্সিজেন লাগবে ! সবুজ লাগবে ! মিষ্টি ফুলের গন্ধ লাগবে ! না হলে সে তো হৃদয়হীন অমানবিক হবে ! পৃথিবী বাঁচবে কীভাবে ? মানুষ বাঁচবে কী নিয়ে ?"

মৃত্তিকার কথাগুলো হাহাকার হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। উপস্থিত সবাই তখন নিরুপায়, নীরব।

---

## ভালোবাসা * মীনা রায় বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝগড়ায় আমার সঙ্গে পারবে ? অনেকেই সমঝে চলে। বলে সরণ্যা বড্ড প্রতিবাদী। জেদী। প্রতিবাদী হলেই কি ভয় সবাই পায় ! যারা ভালো তারাই পায়। দুর্বৃত্তরা যেন হায়না ! ভয়টয় পায় না।

নইলে ওই দুপাশে দীঘি। তারপরে অশত্থতলায়, যেখানে বজরংবলীর পুজো হয় মঙ্গলবারে। প্রণামী-বাক্সের কাছে জমায়েত ছেলেরা। বোতল, প্যাকেট নিয়ে রোজকার আড্ডাতে। আমাকে সেদিন রাত সাড়ে আটটায় আসতে দেখেই অশালীন ইঙ্গিত শুরু, বচসা। ডাকাবুকো আমারও ভয়েই গলা শুকিয়ে কাঠ।পারতপক্ষে ওপথে সন্ধ্যাতে হাঁটি না। দিদিমা অসুস্থ বলেই। ওষুধ কিনতে। পথটা শর্টকাট...। সময়টা বাঁচে।

“এই যে ডাঁটি মেয়ে ! সংকটমোচনের প্রণামীটা ?”

হনহনিয়ে হাঁটছি। আশেপাশের বাড়িগুলোর মানুষজন পথের মানুষের বিপদে জানলা বন্ধ করে।

হঠাৎ আলো। শব্দটা স্তব্ধ।

– সরণ্যা ! বাইকে ওঠো।

– দীপক, তুমি ! চলো।

## কান্না রাগের "হোমা পাখি"

**শাশ্বত বোস**

ঝোড়ো আষাঢ়ের নীহারিকাঘন আকাশটাকে পেছনে ফেলে, জরাজীর্ণ রেললাইনটাকে মহাজাগতিক ভালোবাসার টানে বুকে জড়িয়ে, কোনো এক নাতিদীর্ঘ ম্রিয়মাণ বিকেলে হাট বসেছিল, নবদ্বীপ হাটের এই ছোট্ট জনপদটায়। পূর্ববঙ্গ থেকে ভেসে আসা ছিন্নমূল প্লবতার চিহ্ন গায়ে এঁকে, প্রতিবিম্বের আস্যে বিপরীতগামী চঞ্চল জীবন খুঁজে চলে জায়গাটা। আজ শনিবার রেললাইন দিয়ে মালগাড়ি যাবে না। ইয়ার্ড ঘেঁষে তাই ছোটোখাটো নামগোত্রহীন হকারের রাজত্ব চলে।
রেলপুলিশের আনাগোনা আজ এদিকটায় কমই থাকে। বহু আগে এখানে খেলনা ট্রেন চলতো, অনেকটা পাহাড়দেশের গা বেয়ে চলা ছোট্ট রেলগাড়ির মতো। হারু ছোট থাকতে দেখেছে, তখন লাইনও ছোট ছিল ওর মতো। এখন হারুর বয়স চোদ্দ। ঘটনাটা বছর পাঁচ ছয়েক আগের। আকাশফাটা ঘড়ঘড় শব্দে রেলের লোকেরা দুটো খেলনা বগিকে জোড়া লাগাত, হারু আর ওর বয়সী কটা ছেলে ভিড় করে সেসব দেখত, তখনও হারুর মা বেঁচেছিল। ওর বাপটা তখন ওই খেলনা ট্রেনেই হকারি করতো। বেশ ভিড় হতো তখন ট্রেনগুলো তে। লোকজন গেট থেকে ঝুলে ঝুলে যাতায়াত করতো।। হারুরা দল বেঁধে ট্রেনের কামরার ছাতে চড়ে বসত। ট্রেনে চড়েই ওদের দিন কাটত। ঘরে কতদিন ওর মা বসে থাকতো ভাতের থালা নিয়ে।

বছর দুয়েক হল একটা অজানা অসুখে হারুর মা মারা গেছে, শেষদিকে খালি মুখ দিয়ে রক্ত উঠত, ওর বাপ বলেছিল "ক্যান্সার!" মা টা মারা যাবার পর থেকেই ইস্কুল ছেড়ে গেল হারুর, খেলনা ট্রেনও এখন আর নেই। ও আর ওর বাপ মিলে এখন হকারি করে, সপ্তাহে এ কদিন এখানটায় বসে, মেয়েদের সায়া-ব্লাউজ, ছেলেদের গেঞ্জি-
জাঙ্গিয়া, বারমুডা এইসব নিয়ে ওর বাপটা হাঁক পাড়ে, "হরেক মাল তিরিশ টাকা, বিশুইদ্ধ মাল তিরিশ টাকা,
লইয়া যান বৌদি, ও দাদা!", সঙ্গে হারু সামলায় চারদিক।
সেদিন হারুটা একটু অন্যমনস্ক ছিল, কি জানি কি ভাবছিল, ওর বাপটা ধমক দিয়ে থাবড়ায় ওর গালে "মারইনের পো, কি দ্যাখস, মাগী?" হঠাৎ প্রচন্ড শব্দ করে মালগাড়ি ঢুকতে থাকে লাইনে, তেড়ে আসে রেলপুলিশ, সবার দোকানের জিনিস আছড়ে ফেলতে থাকে। পড়ি কি মরি করে দৌড় দেয় হারু, বাপের দিকে, জিনিসগুলোর দিকে তাকানোর আর সময় পায় না। ছুটতে ছুটতে মাঠ পেরিয়ে, কাঁচা পাকা টিনের চালের বাড়িগুলো পেরিয়ে, ঢোকে শাঁখারীপাড়ার গলিতে। ও জানে এটা "মাগী পাড়া", চট করে এদিকটায় আসে না ও। দূরে দাঁড়ানো মেয়েটা, পড়নে টাইট ফিটিং ব্লাউজ আর সেমিজ হাঁটু অবধি তোলা, মুখে রং মেখে ওকে দেখে চোখ টেঁপে, দাঁতে ঠোঁট কামড়ে, ইশারায় ওকে ডাকে, সে-চোখে তখন কাঙালিনীর শরীর নেঙড়ানো হিসেবি আগুন জ্বলে। পশ্চিমের আকাশে তখন কামুক যৌনতা, আকাশের সাথে মৌসুমীর নিগূঢ় আঁতাত। হারু চোখ বোজে, ওকি ওঁর মাকে খোঁজে ?

## কেমন করে লিখতেন রবীন্দ্রনাথ

**রথীন কর**

অনেক দিনের এই ডেস্কো---
আনমনা কলমের কালিপড়া ফ্রেস্কো
দিয়েছে বিস্তর দাগ ভুতুড়ে রেখার।

তা এই ডেস্কোতে কেমন করে লিখতেন সেই আশ্চর্য পুরুষ ? শিশুকাল থেকেই শুরু হয়েছিল সাহিত্যচর্চা। তখনও কলম এসে পৌঁছয়নি হাতে। লেখবার উপকরণ ছিল কাগজ, পেন্সিল, স্লেট। ‘সন্ধ্যাসঙ্গীত’ পর্যন্ত লিখেছেন প্রধানত স্লেটের ওপরে। ‘বলাকা’র প্রায় সব কবিতা লিখেছেন পেন্সিল দিয়ে। পরে এলো সাদা বা রুলটানা ফুলস্ক্যাপ এক্সারসাইজ বুক, নোটবুক, ডায়েরী, প্রুফের পাতা ও মাসিক পত্রের সাদা পাতা। বাল্যকালে ব্যবহার করেছেন 'লেটস' ডায়েরী।তার পরে কোহিনুর ডায়েরী, নারায়ন’স ডায়েরী, জেমস ডায়েরী প্রভৃতি। বার্ধক্যেও নিজের রচনা নিজেই কপি করেছেন। সব সময় চলতো পরিবর্তন, বর্জন ও পরিমার্জন। কবিতার সঙ্গে তাঁর মালাবদল হয়েছিল সাড়ে চার বছর বয়সে। খাতার পাতায় শুরু সাত বছর বয়সে। নীল কাগজের ফুলস্ক্যাপ খাতা। কবি-কীর্তি সর্বদা পকেটেই থাকতো। বিজ্ঞাপনী কাজটি করতেন দু’বছরের বড় দাদা সোমেন্দ্রনাথ। পরিচিত কেউ এলেই ধরে বসতেন। বলতেন ''রবি একটা কবিতা লিখেছে, শুনুন না।'' ‘সেই নীল খাতাটি করুণাময়ী বিলুপ্তি দেবী কবে বৈতরণীর ভাঁটার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন’(‘জীবনস্মৃতি’)। ১৮৭৪ সালে কবি পিতৃদেবের সঙ্গে প্রথম এলেন শান্তিনিকেতনে। হাফ-টিকিটের যাত্রী। সঙ্গী পুরোনো একটি ‘লেটস’ ডায়েরি এবং পেন্সিল। ধারণা ছিল, খোলা আকাশে গাছের তলায় বসে কবিতা লিখলে, ঠিক দস্তুরমতো কবিত্ব করা যায়। তাই ‘লেটস’ ডায়েরী এবং পেন্সিল হাতে ভোরবেলাতেই একটা ছোট্ট নারকেল গাছের তলায় মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে খাতা ভরাতে লাগলেন। এখানে তৃণহীন কঙ্কর-শয্যায় রৌদ্রের উত্তাপে ‘পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে দিন সাতেক ধরে একটি বীর-রসাত্মক কবিতা লিখলেন। তাঁর কথায়- 'কবির যেরকমটি হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে তখন আমার বিশেষ দৃষ্টি ছিল—দুপুরবেলায় মাঠের ভেতর খোয়াইয়ের মধ্যে পা ছড়িয়ে দিয়ে বসতুম। সামনে দিয়ে ক্ষীণ জলস্রোত বয়ে যেত। আপনাকে রীতিমতো কবি-কবি বলে মনে হত’। এই ‘লেটস’ ডায়েরীটি শান্তিনিকেতন থেকে সাহেবগঞ্জ দানাপুর এলাহাবাদ কানপুর অমৃতসর হয়ে ডালহৌসি পাহাড় পর্যন্ত ভ্রমণসঙ্গী হয়েছিল।এই ডায়েরীতেই লিখিত হয়েছিল কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কবি-কাহিনী'। সতেরো বছর বয়সে কবির প্রথম বিলেত যাত্রা। বিলেতবাস কালে 'ভগ্নহৃদয়' নামে একটি কাব্যগ্রন্থের সূচনা। দেশে ফেরার পর সেটি প্রকাশিত হয়। কাব্যটি পাঠ করে তৎকালীন ত্রিপুর-নরেশ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর এতটাই অভিভূত হয়েছিলেন যে, মন্ত্রী কর্নেল মহিম ঘোষকে জোড়াসাঁকোয় পাঠিয়ে সদ্য যুবক কবিকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এক অসম বয়সের চিরস্থায়ী বন্ধুত্বের সূচনা হয়েছিল। পরের পর্ব শিলাইদহে। জলপথে ‘পদ্মা’ বোটে।

সংসারের দায়দায়িত্ব নেই, নির্জনতার অভাব নেই। যখন খুশি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের ওপর
পা তুলে দিয়ে আকাশ আলোক ও আলস্যপূর্ণ জীবনে নিমগ্ন হয়ে থাকতেন। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'আমার ধারণা বাবার গদ্য ও পদ্য, দু'রকম লেখারই উৎস যেমন খুলে গিয়েছিল, তেমন আর কোথাও হয় নি।---বাবা সমস্ত দিন ধরে লিখতেন। লেখার ঝোঁক যখন বেশি চাপতো তখন খাওয়াদাওয়া একদম ছেড়ে দিতেন।এভাবেই লেখা চলতো শিলাইদহ, সাজাদপুর ও পতিসরে। জোড়াসাঁকোয় দক্ষিণদিকের একটি নিরালায় ছিল তাঁর লেখার ঘর। আসবাবের বালাই নেই--একটি চীনে ডেস্ক এবং একটি চৌকি।

স্নানের ঘরে তাঁর গান আসতো। 'নাবার' ঘরেই 'নৈবেদ্য'র কিছু কবিতা লেখা হয়েছে। কবির জীবনের দ্বিতীয়ার্ধের বেশির ভাগ সময় কেটেছে শান্তিনিকেতনে। উত্তর প্রান্তের একটি মাটির কুটিরে ছিল তাঁর অবস্থিতি। দরজা-জানলা বলতে সবই দরজা সবই জানলা। কন্যা মীরা দেবী লিখছেন--'বাবা সেই সকালবেলা লিখতে বসতেন । স্নানাহারের জন্য যেটুকু সময় দরকার কেবল সেইটুকুর মত তাঁর কলম বন্ধ থাকতো।---তখন বাইরে রোদে কাঠ ফেটে যাচ্ছে ও লু-এর মতো গরম হাওয়া বইছে। যতই গরম হোক না কেন, কখনো দরজা-জানলা বন্ধ করতেন না।' কবির নিজের কথায়, কাব্য-গান রচনার পক্ষে বসন্ত, গ্রীষ্ম ও
বর্ষা ঋতু তাঁর পক্ষে অনুকূল ছিল। শীতের সময়টা গদ্য-প্রবন্ধ লেখা, বক্তৃতা দেওয়া সহজ হয়। তাঁর দিন শুরু হত ভোর চারটেয়। লেখার টেবিলে বসার আগে আধঘন্টা ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকতেন।
তাঁর পরিণত বয়সের পাণ্ডুলিপিগুলি কোনো লেখকের লেখা না চিত্রকরের শিল্পকর্ম, কে বলবে ! প্রায় প্রতিটি পাতায় কাটাকুটির মধ্যে থেকে বিচিত্র সব ছবি বেরিয়ে এসেছে। মনে হয় ছবির আলবাম--মনে হবে আঁকা ছবিকে ঘিরে কিছু নৃত্যময়ী অক্ষর-সরণি। এই সব দেখেই কি ভিক্টোরিয়া তাঁর মধ্যে এক চিত্রশিল্পীকে আবিষ্কার করেছিলেন !

একদিন বনফুল এসে দেখলেন কবি টেবিলের ওপর ঝুঁকে কিছু লিখছেন। বনফুল বললেন—'গুরুদেব এখন অনেক ভালো ধরনের চেয়ার-টেবিল পাওয়া যায়।এত কষ্ট করে লেখার কী দরকার ?' পরিহাসপ্রিয় কবি উত্তর দিলেন—'কুঁজোর জল ফুরিয়ে আসছে। এখন উপুড় না করলে জল পড়বে না।' শান্তিনিকেতন থেকে কবির শেষবারের মতো জোড়াসাঁকো অভিমুখে যাত্রা। হাওড়া স্টেশনে নিরাপত্তা-বলয় ভেদ করে এক বালিকা একটি খাতা এগিয়ে দিয়ে বললে, 'একটা সই দাও না।' কী করে নিরাশ করেন কবি ? অসুস্থ শরীরে লিখলেন--

সই
চাই সই
তাই সই

কম্পিত হস্তে সই করে দিলেন - 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। বোধ করি এটাই তাঁর পূর্ণাঙ্গ স্বাক্ষর।এর পরে প্রতিমা দেবীকে লিখিত (মুখে বলেছিলেন ) তাঁর শেষ পত্রে অতি কষ্টে সই করেছিলেন 'বাবামশায়'।

আকাশে বরুণে দূর স্ফটিক ফেনায়
ছড়ানো তোমার প্রিয়নাম,
তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা--
কোনখানে রাখব প্রণাম !

(প্রণমি / দীনেশ দাশ)

**তিনি অশ্বত্থামা * চৈতালী রায়**

তিনি অশ্বত্থামা, আত্মবিস্মৃতির এক অবিস্মরণীয় নাম।

তিনি ঋষি ভরদ্বাজের নাতি ছিলেন; পিতা গুরু দ্রোণাচার্য এবং মাতা কুলগুরু কৃপাচার্যের বোন কৃপি। শিবের মত মহা পরাক্রমশালী পুত্রসন্তান লাভ করার জন্য দ্রোণ ভগবান শিবকে সন্তুষ্ট করতে বহু বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তিনি একটি বনের গুহায় জন্মগ্রহণ করেন, যেটি বর্তমানে তপকেশ্বর মহাদেব মন্দির, উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে অবস্থিত। শিবের আশীর্বাদ স্বরূপ অশ্বত্থামা কপালে একটি মূল্যবান এবং শক্তিশালী রত্ন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। এটি তাঁকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, বার্ধক্য, সকল প্রকার রোগ, অস্ত্র এবং দেবতাদের থেকে রক্ষা করতো। ঐশ্বরিক রত্নটি অশ্বত্থামাকে অজেয় এবং অমর করে তোলে।

মহাভারতের গল্পে তিনি প্রথম এলেন দারিদ্র্যে অতিষ্ঠ এক ব্রাহ্মণপুত্র হিসেবে।

দ্রোণ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হলেও সামান্য অর্থ ও সম্পত্তি নিয়ে সরল সাধারণ জীবন যাপন করতেন। ফলে অশ্বত্থামাকে চরম অভাবের মধ্যে দিয়ে শৈশবজীবন পার করতে হয়েছে। এমনকি দুধের খরচও পরিবার বহন করতে সক্ষম ছিল না। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে দ্রোণ তাঁর সহপাঠী পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কাছে যান - সহপাঠী অবস্থায় দ্রুপদ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন - তিনি রাজা হলে অর্ধেক রাজত্ব বন্ধু দ্রোণকে ভাগ দেবেন। দ্রোণ তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে গেলে দ্রুপদ-রাজা দ্রোণকে বলেছিলেন - ভিখারী কখনো রাজার বন্ধু হতে পারে না। দ্রোণ এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

মহাকাব্যের আদিপর্ব অনুসারে, অশ্বত্থামা জন্মের সময় স্বর্গীয় ঘোড়া উচ্চৈঃশ্রবার হিংগনের মত উচ্চস্বরে চিৎকার করেছিলেন। তখন স্বর্গ থেকে ঐশ্বরিক কণ্ঠস্বর ঘোষণা করে তাঁর নাম অশ্বত্থামা রাখা হয়।

অশ্বত্থামাকে শিব, যম, কাম এবং ক্রোধ দেবতাদের সম্মিলিত অবতার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মেও তিনি ক্ষত্রিয়ধর্মে প্রতিপালিত হয়েছেন। ক্ষত্রিয়ের মত যুদ্ধবিদ্যা ও রাজ্য-পরিচালনার কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাই তাঁকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলা যায়। তিনি চিহ্নিত রাজা হয়েছেন।

হস্তিনাপুরের শাসকদের অধীনস্থ হয়ে অহিছত্রকে রাজধানী করে পাঞ্চালের উত্তরাঞ্চল শাসন করেছিলেন। ব্রাহ্মণকুলে জন্মেও ব্রাহ্মণত্বের সব গুণ অশ্বত্থামা বহু দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রতিশত্রুতার বিরামহীন শৃঙ্খলের মধ্যে তাঁর কাজে ভয়ঙ্করতার এবং নির্দয়তার কোন তুলনা নেই।

কুরুকুলের ছেলেদের সঙ্গে থেকে তিনি বাবার কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখলেন। কিন্তু সেই সময়ের তরুণ যোদ্ধাদের কাছে অর্জুনের মত কখনই যোদ্ধৃপণার প্রতীক বলে অশ্বত্থামা গণ্য হননি। তিনি একজন বড় যোদ্ধা - একথা কেউ ভাবেননি - এমনকি দুর্যোধনও নন। কৃষ্ণের সাথে শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হলে, তিনি পিতার সাথে কৌরব পক্ষে যোগ দেন।

অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে অংশগ্রহণ করেন এবং পরে দুর্যোধনের সাথে তাঁকে দেখা যায়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে অভিজাত অতিথি হয়ে ব্রাহ্মণদের গ্রহণের দায়িত্বে থাকেন।

হস্তিনাপুরের রাজসভায় দ্রৌপদীকে অপমান করার সময়েও অশ্বত্থামা তাঁর বন্ধু দুর্যোধনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন।

পান্ডবদের বনবাসের সময় অশ্বত্থামা কৌরব সেনাবাহিনীর সাথে মৎস্য রাজ্য আক্রমণ করতে যান ।

মহাভারতের এক ট্র্যাজিক নায়ক অশ্বত্থামা। কর্ণের মতই তিনিও ছিলেন মহারথী। কিন্তু অধর্মের নামে নিজের অস্ত্র বিকিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সে কারণেই মহাগুরু দ্রোণাচার্যের পুত্র হয়েও, ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত করেও তিনি কৃষ্ণের শাপ পেয়েছিলেন। দুর্যোধনের প্রতি সমর্পিত ছিল অশ্বত্থামার অস্ত্র।

বাবার মৃত্যুর সময় তিনি দম্ভ করে বলেছিলেন - পান্ডবদের মেরে ফেলবেন। দ্রোণ মারা যাওয়ার পর তিনদিন যুদ্ধ হয়েছিল।

কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিনি মারতে যাননি। কারণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করার সাহস তাঁর ছিল না। যে দুর্যোধনের প্রতি তিনি সহানুভূতি দেখাচ্ছিলেন - তাঁর বিনাশের কারণ তিনিই। সঞ্জয়ের কাছ থেকে খবর জেনে অধৈর্য, চিন্তাহীন ও তাড়াহুড়োর জন্যই সময়ের বিচার না করে, দিনের আলোতে রাজার কাছে গেলেন এবং জোরে জোরে কথা বলে দুর্যোধনের লুকোনোর জায়গাটা পান্ডবদের দেখিয়ে দিলেন। পান্ডবরা যখন এলেন তখন তিনি ভীরুর মত পালিয়ে গেলেন।

ভয়াবহ পরাজয়ের পর অশ্বত্থামা, কৃপ এবং কৃতবর্মা - এই তিনজন যোদ্ধা বেঁচেছিলেন। দুর্যোধনের মৃত্যুর আগে দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে কৌরবদের সেনাবাহিনীর চূড়ান্ত সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করেন। অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে বলেছিলেন, আপনার জন্য কি করলে আপনি নিশ্চিন্তে মৃত্যু বরণ করতে পারবেন ? অশ্বত্থামার প্রশ্নের উত্তরে দুর্যোধন বলেছিলেন, পান্ডব বংশের ধ্বংস দেখে তিনি নিশ্চিন্তে মরতে চান।

সেনাপতি পদে তাঁর অভিষেক হয়েছিল অবজ্ঞার যোগ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু কৌরবকুলের এই শেষ সেনাপতি, সেনাপতি পদে অভিষেক হওয়া মাত্রই রাজাকে ফেলে পালিয়ে গেছিলেন।

রাজার শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে তিনি যুদ্ধের সমাপ্তি মেনে নিলেন না। যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির পরের রাতে, যুদ্ধের আঠারো দিনের পরের রাতে অশ্বত্থামা - কৃপ এবং কৃতবর্মাকে নিয়ে পান্ডব শিবিরের কাছে একটি বনে ভ্রমণ করতে গিয়ে একটি বিশাল বটবৃক্ষের নিচে আশ্রয় নেন। রাত নামলে অশ্বত্থামা ঘুমের মধ্যে একটি পেঁচাকে একদল কাককে হত্যা করতে দেখেন - এই অশুভ ব্যাপারটি তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে ঘুমন্ত পান্ডব সেনাবাহিনীদের হত্যা করতে। কৃপের তীব্র আপত্তি এবং নৈতিক আপত্তিকে উপেক্ষা করে অশ্বত্থামা তাঁর সঙ্গে তাঁদের যেতে বাধ্য করেন। অশ্বত্থামা - কৃপ এবং কৃতবর্মাকে দ্বার পাহারায় নিযুক্ত রেখে রাতের অন্ধকারে পেছনের দরজা দিয়ে তিনি পান্ডব শিবিরে ঢুকে প্রথমে ঘুমন্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে যোদ্ধার মৃত্যু থেকে বঞ্চিত করে নিরস্ত্র অবস্থায় নির্দয়ভাবে হত্যা করেন। পরে পাঁচ দ্রৌপদীপুত্রকে মারলেন। এরপর যত সংখ্যক মারা সম্ভব তা পূরণ করলেন। তারপর তিনজনে মিলে শিবিরে আগুন ধরিয়ে দেন । পান্ডবদের খবর দেবার জন্য একমাত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি পালিয়ে যান ।

ভোরবেলা তিনজন দুর্যোধনের কাছে ফিরে আসেন, তিনি অশ্বত্থামার প্রশংসা করেন এবং মারা যান। এঁরা ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীকে রাতের অভিযানের কথা জানান এবং তিনজন বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যান। তাঁর কৃতকর্মের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পান্ডবরা এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পেছনে আসছেন জেনে, অশ্বত্থামা ব্যাসদেবের আশ্রমে তপস্বী সেজে আশ্রয় নেন।

দ্রৌপদীকে হত্যাকাণ্ডের স্থানে আনা হয় - তিনি অশ্বত্থামার বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমরণ অনশনের কথা ঘোষণা করেন।

পিতৃহত্যার প্রতিশোধ এবং নিজেকে বাঁচানোর জন্যই তিনি অর্জুনের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মশীর্ষের জন্য মন্ত্র দিয়ে একটি ঘাসের ফলক চাপিয়ে অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করেন। অর্জুন একই রকম অস্ত্র ব্যবহার করলেন । দুই অস্ত্র এক জায়গায় মিললে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে বলে ব্যাসদেব মাঝখানে এসে অর্জুনকে অস্ত্র ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বললেন । অর্জুন অস্ত্র ফিরিয়ে নিলেন। অশ্বত্থামা ফেরালেন না, কারণ ক্ষেপণাস্ত্র প্রত্যাহার করার নিয়ম তাঁর জানা ছিল না। এরপর অর্জুন দ্রৌপদীকে দেওয়া কথা রাখতে অশ্বত্থামাকে বেঁধে দ্রৌপদীর কাছে নিয়ে এলেন, ঘোষণা করলেন - তাঁকে হত্যা করবেন।

দ্রৌপদী সন্তান হারানোর যন্ত্রণা বুঝে অর্জুনকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করলেন। তিনি যে যন্ত্রণা পেয়েছেন - অশ্বত্থামার মাকে সেই যন্ত্রণা ভোগ করতে দিতে চান নি । ভীম চেয়েছিলেন - খুনি হিসেবে অশ্বত্থামার মৃত্যুদণ্ড হোক। যুধিষ্ঠির ক্ষমা প্রার্থনা করে বক্তব্য রাখেন। অর্জুন পথ নির্দেশনা চেয়ে, সমাধানের জন্য শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাইলেন। কৃষ্ণ বললেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতার সাথে হত্যা করে তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত। কিন্তু ব্রাহ্মণের পুত্রকে হত্যা করা উচিত নয়। অর্জুন কৃষ্ণের ভাষার অর্থ বুঝে অশ্বত্থামার কপাল থেকে মণিরত্নটি কেটে বের করে নেন । এই শাস্তিটি তাঁর মর্যাদাকে ধ্বংস করবে যা তার জীবন নেওয়ার সমান । কর্ণের

যেমন কবচ-কুন্ডল, অশ্বত্থামারও তেমনই ওই মণি। মুক্তি পাবার পর দুষ্ট স্বভাবের কারণে প্রতিশোধের বশবর্তী হয়ে তিনি আবারও ব্রহ্মাস্ত্র যুক্ত করেন, এবার অর্জুনের নাতিকে লক্ষ্য করে। অভিমন্যুর পুত্র তখন উত্তরার গর্ভে ছিল। কৃষ্ণ একটি ক্ষুদ্র রূপ ধারণ করে উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করেন, ব্রহ্মাস্ত্রকে নিষ্ক্রিয় করেন এবং অন্তরস্থ শিশুটিকে দর্শন দেন । সাথে অশ্বত্থামাকে শাপ দিলেন - 'তুমি যেভাবে পাপকর্মের দ্বারা দ্রৌপদীর এবং উত্তরার প্রেমকে চিরকালের জন্য দুঃখিত করেছ, ঠিক একইভাবে তোমার এই অমূল্য রত্নটির ব্যত্যয় তুমিও ভোগ করবে। আঘাতের রক্ত এবং পুঁজ নিয়ে বনে ঘুরে বেড়াবে। এতগুলো অন্যায় হত্যার জন্য ক্ষত নিয়ে বেঁচে থাকবে, মৃত্যু চাইবে কিন্তু মরবে না। মৃত্যুর মাধ্যমে মুক্তি পাবে না। চাইলেও আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়োতে পারবে না। অন্যদের যে যন্ত্রণা দিয়েছ, তা অনুভব করতে সক্ষম হবে এবং কখনও শান্তি পাবে না। কয়েক হাজার বছর তুমি বেঁচে থাকবে, পৃথিবীর ওপর জঙ্গলে ও মরুভূমিতে তুমি অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু কোনো মানুষ তোমাকে আশ্রয় দেবে না।' এরপর অশ্বত্থামা বনে চলে যান ।

অন্য সব সেনাপতিরা বীরের মৃত্যু মরেছিলেন - অশ্বত্থামা ঐ বীরের মরণের থেকেও ভয়ঙ্কর এক জীবন যাপন করেছিলেন।

প্রচলিত বিশ্বাস, মধ্যপ্রদেশে ইন্দোরের কাছে আসিরগড় দুর্গে আজও বাস করছেন অশ্বত্থামা। এই দুর্গই এখন অশ্বত্থামার আবাসস্থল। বিগত ৩০০০ বছর ধরে এখানেই রয়েছেন তিনি। সবার চোখের আড়ালে।

কাহিনী বলে, আশিরগড় দুর্গে এক শিবমন্দির রয়েছে। প্রতি প্রভাতে শিব উপাসক অশ্বত্থামা সবার আগে সেই মন্দিরে পূজার্চনা করেন। ভোরের আলো ফুটলেই দেখা যায়, শিবলিঙ্গ সাজানো রয়েছে ফুলে, চন্দনে। কিন্তু কোথা থেকে সেই ফুল-চন্দন এল, কেউ বলতে পারেন না। বলতে পারেন না, কখন এসে অশ্বত্থামা নিত্যপূজা সম্পন্ন করেছেন।

তবে রাতের বেলায় এই দুর্গে অনেকেই দেখেছেন দ্রোণপুত্রকে । দেখা গিয়েছে, রক্তাক্ত কপাল নিয়ে তিনি হাহাকার করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দুর্গে। কারও সঙ্গে দেখা হলে ক্ষতের জ্বালা জুড়োবার জন্য তিনি হলুদ আর চন্দন ভিক্ষা করেন।

কিন্তু অশ্বত্থামার সেই ভীষণ, রক্তঝরা রূপ যাঁরাই দেখেছেন, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন । অনেকে উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন চিরতরে। আসলে, প্রখর পাপবোধ আর অভিশাপের জ্বালা নিয়ে যিনি ছটফট করছেন মুক্তির জন্য, তাঁর মুখোমুখি হওয়া বড় সহজ নয়। ভয় না পেলেও আত্মদহন হবেই ।

অশ্বত্থামা একটি বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, সেটি হল দীর্ঘজীবন অথবা অমরত্ব - অভিশাপ না আশীর্বাদ ? অশ্বত্থামা কৃষ্ণের কাছে মৃত্যুবর চেয়েছিলেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত কৃষ্ণ চেয়েছিলেন আরও কিছুদিন বাঁচতে। দ্বারকায় তিনি ধর্ম ও ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। পারেন নি। আপন হাতে আপনার সৃষ্টিকে ধ্বংস করে তিনি নতুন প্রজন্ম বিনির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। সফল হননি। অশ্বত্থামা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই পুরুষের স্বপ্ন - অভিশাপের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রতিশোধ, সন্ত্রাস, যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের ওপর, মূল্যবোধের ভিতরে ওপর নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন সফল হবে কি ? তথ্যসূত্রঃ

১) https:// bn.wikipedia.org
২) https:// en.wikipedia.org
৩) https:// lekhalikhi.sobbanglay.com
৪) https:// inscript.me
৫) https://kingbadonti.com
৬) আসিরগড় দুর্গে আজও ঘুরে বেড়ায় মহাভারতের এই চরিত্র ! Appeared first on Sangbad Pratidin

**জাপানে রবীন্দ্রনাথ  * প্রবীর বিকাশ সরকার**
**( লেখক জাপান প্রবাসী রবীন্দ্র গবেষক )**

কবিগুরু জাপানকে কতখানি ভালোবেসেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর স্বরচিত অনেক রচনায়। 'জাপান যাত্রী' ভ্রমণকথা অন্যতম। বিপরীতে, কবির জীবদ্দশায় তাঁকে জাপানিরা কতখানি ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন তার উজ্জ্বল উদাহরণ রয়েছে জাপানিদের রচিত অপরিমেয় মুদ্রিত দলিলপত্রে।

আজও প্রবীণ ও নবীন প্রজন্মের অগণিত জাপানি নাগরিক বিশ্বকবিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছেন নানা প্রসঙ্গে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এত মাতামাতি বিশ্বের আর কোনো জাতি করেছে বা করে চলেছে তার দ্বিতীয় নজির নেই বলে আমার একান্ত বিশ্বাস। কবিগুরুর আপন ভাষাভাষীর মানুষ বাঙালিরাও এত মাতামাতি করেনি বা করে না। এর মূল কারণ কী ?

অনেক জাপানি নাগরিকের ধারণা, এশিয়ায় প্রথম নোবেল পুরস্কার অর্জনই এই উপসর্গের প্রধান কারণ। এশিয়ার প্রথম আধুনিক শিল্পোন্নত রাষ্ট্র হিসেবে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে পুরো বিংশ শতক জুড়ে জাপানে শিল্পকলা, সাহিত্য, শিক্ষা, গণমাধ্যম, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা ইত্যাদিতে প্রভূত উত্তরণ ছিল বিস্ময়কর ঘটনা। সুতরাং এশিয়া মহাদেশে নোবেল পুরস্কারে যদি কেউ ভূষিত হয়, তাহলে স্বাধীন রাষ্ট্র জাপানের অগ্রসরমান কোনো নাগরিকই হবেন, এই সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল জাপানের বুদ্ধিজীবী সমাজের। কিন্তু ইংরেজের উপনিবেশ ইন্ডিয়া থেকে অখ্যাত কোনো কবি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়ে যাবেন সাহিত্যে, তাও আবার ক্ষুদ্র সংকর জনগোষ্ঠী 'বাঙালি'দের মধ্য থেকে --এটা ঘট উল্টে যাওয়ার মতোই ঘটনা বলে তাদের চোখে দৃষ্টমান হয়েছিল ! অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল !

প্রকৃতপক্ষে, নোবেল যদি না পেতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাহলে তাঁর নাম বা পরিচিতি জাপানে কোনোকালেই প্রচারিত হত না। মাতামাতি তো দূরের কথা ! তাঁর নাম এদেশে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল মনীষী শিল্পাচার্য ওকাকুরা তেনশিনের মুখে। ১৯০২ সালে আকস্মিক ভারতভ্রমণকারী ওকাকুরা রাজধানী কলিকাতায় কবিগুরুর সঙ্গে পরিচিত হন স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে বলে কথিত আছে। পক্ষান্তরে, স্বামীজির প্রধান শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার মাধ্যমে বলেও প্রচারিত আছে। এই ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । প্রধানত, পরবর্তীতে সমগ্র এশিয়ার রাজনৈতিক মানচিত্রকেই আমূল পাল্টে দিয়েছিল এই ঘটনা।

ওকাকুরা ভারতে প্রায় দশ মাস অবস্থানকালে কলিকাতায় কিছুদিন রবীন্দ্রনাথের ভাইপো বিপ্লবী ও ব্যাংকার সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন। সেই সালেই ওকাকুরা ভারত থেকে ফিরে এসে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সভার আয়োজন করেন তাতে অনধিক সত্তর জন বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত থেকে তাঁর ভারতভ্রমণের অভিজ্ঞতা শ্রবণ করেছিলেন। বলাই বাহুল্য, ঐতিহ্যবাহী ঠাকুর পরিবারের উদীয়মান কবি ও মুক্তচিন্তাজগতের তারকাসদৃশ রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ ছিল ওকাকুরার বক্তব্যে। এরপর ১৯১৩ সালে নোবেল অর্জন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নাম জাপানে প্রায় অনুচ্চারিত ছিল বলাই শ্রেয়। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের পবিত্র জন্মস্থান ভারতভক্ত কতিপয় জাপানি বৌদ্ধ পুরোহিত, ভিক্ষু, গবেষক এবং ওকাকুরাশিষ্য চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ার তথ্য জানা যায়।

১৯১৩ সালে নোবেল পাওয়ার পরই দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথের নাম জাপানে, কোরিয়ায় এবং চিনে। অবশ্য এশিয়ার অন্যান্য পরাধীন দেশেও। ১৯১৪ সালেই বিক্ষিপ্তভাবে রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি" কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতা অনুবাদ শুরু হয় ইংরেজি থেকে। ক্রমে ক্রমে দ্রুতহারে প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি। আর হু হু করে বৃদ্ধি পেতে থাকে ভক্তের সংখ্যা। প্রথম রবীন্দ্র-ধুম দেখা দেয় জাপানে, যা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ পাঁচবার জাপান ভ্রমণ করেন ১৯১৬ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত। সৃষ্টি হয় বহু ঘটনা আর ইতিহাস। বাঙালি সেসব জানে না বললেই চলে।

---

## পুজোর ছড়া

**আগমনীর গান * সুদীপা সাহা**

ঢংঢং ঘন্টা  উৎসুক মনটা
টাবু-টুমি খুব খুশি  নন্টা ও ফন্টা
ছুটি ছুটি গন্ধ   বন্ধ বইটই
পাড়া জুড়ে হল্লোড়   শোরগোল হইচই
ইমেল-টিমেলে  ভাসে শরতের খুনসুটি
শিউলি ও শিশিরের মাটিতে লুটোপুটি
পুজো-পুজো গন্ধে  সাজে সাঁঝ ছন্দে
কাশফুল দুলদুল নাচে খানাখন্দে
ছড়া ও গল্পের সাথে আজ মস্তি
আগমনী-গান শুনে সবুজের স্বস্তি।



# ক বি তা মা লা ৩

---

**যাযাবর মন * অনুশ্রী দত্ত**

যাযাবর মন শোনে না বারণ
দুর দিগন্তে ধায়,
আবার কখনো রাতের আকাশে
তারাদের ছুঁতে চায় !

কখনো সে ভাবে একছুটে যাবে
বহুদূর দেশে চলে,
মনটা যখন ব্যাকুল তখন
আরো কত কি যে বলে !

অস্থির এ মনে শুধুই তখন
উদাসীনতার ছবি,
কভু মেঘ ভাসে কখনো বৃষ্টি
কখনো প্রভাত রবি ।

এই মন চায় মেঘের ভেলায়
পাখির মতই ভাসি,
চেনা জানার সীমানা ছাড়িয়ে
পৃথিবীটা ঘুরে আসি !!

**মধুর প্রতিশোধ * সারদা হালদার**

অপ্রিয় সত্য কথন বলতে মুখে বারণে,
নিরবধি আমি তাই কবিতা যাপনে !
শখের বশে আমি শব্দচাষী
মনবাগানে মোর শব্দেরই চাষ,
সিজনে সিজনে নয়কো
তা দেখ তুমি বারোমাস।
পরিণত মনস্কা নীরবতাকে শ্রেয় মানি, মধুর
প্রতিশোধ নিতে
কলমই চরম হাতিয়ার জানি !
আগাছাস্বরূপ অনর্থক যত শব্দকে
বাধ্য হই দায়িত্ব নিয়ে উপড়ে ফেলে দিতে !
প্রত্যেকেরই তো আশা থাকে
উচ্চ ফলন ও উন্নত ফসল পেতে।

**তোমার ভাষায় * অসীম মালিক**

অনেকখানি পথ হেঁটে এসেছ,
না তাকিয়েছ পিছনের দিকে,
না তাকিয়েছ পাশে।
যা মন চেয়েছে তাই করেছ।
কব্জা করতে পেরেছ কী
কোনও হৃদয় ?
সময় এসেছে
একবার ফিরে তাকানোর।
এবার তাকাও,
ফেলে আসা রাস্তার দিকে।
দ্যাখো, রাস্তা কেমন কথা বলছে
তোমার ভাষায়।

**কবিগুরু * সুতপা মান্না**

এ ভুবনতটে জন্মিলে তুমি
ধন্য আমরা হলাম
তোমারই মন্ত্রে তোমারই মনে
আমরা জায়গা পেলাম
তোমারই দেওয়া নিবেদনে
জগৎ মুগ্ধ আজ
তোমারি দেওয়া গানের ডালিতে
সবে নেচে ওঠে আজ ।
তোমার গল্পে তোমারি কাব্যে
তোমার নাটক তোমারি গদ্যে
তোমার ছবিতে পটভূমিতে
তোমার হৃদয়ের ভরা ঝুলিতে
তোমার গানের সুরের ধ্বনিতে
সকলি মুগ্ধ আজ ।

**অসহনীয় * সৌম্য পাল**

অলস দুপুর হেঁটে চলে গেছে,
ট্রেনে কাটা পড়া একটা লাশ – কাঁদছে !
রক্ত জমাট বেঁধেছে নিম্ন তলদেশে,
বাতাসে পোড়া গন্ধ ভাসছে !

একটা ভালোবাসার খিদে চোখ জুড়ে,
না পাওয়াগুলো চুমু খেতে পারলো না !
শত আঘাত সহ্য করেছে নিষ্পাপ দেহে,
কাকে নিষ্ঠুর বলবো ভেবে পাচ্ছি না !

শোকসভায় এক মিনিট নীরবতা পালন,
দীর্ঘ যাত্রাপথে এইটুকুই প্রাপ্য সম্মান !
নাকি চলছে হিসেবের দর কষাকষি,
ফোটো-ফ্রেমে বন্দী শেষ মৃদু হাসি !

**বেড়ানো * তরুণ মিত্র**

আমার আট বছরের বিচ্ছু সোনা
বউয়ের আঁচলের আদর সুগন্ধ মেখে বলল-
ঝরনাতলায় যাবো বাবা। আমার মুখের
দিকে উল্লাস উড়িয়ে মা বললে, 'খোকা, পাহাড়ে এক
বিবর্ণ বরফের আভা খেলা করে বল্ ?' আমি ছাড়লাম সম্মতি।
দু'বছরের ব্যবধানে বেড়ে ওঠা মেয়েটা আমার,
পাঞ্জাবির আতরে মুখ ঘসে-ঘসে শুধোল,
সমুদ্রের নোনাজলে খেলা করবো না, বাবা !
পাশের ঘরে, খবর কাগজের শরীরে চোখ রাখা
আমার পুরোনো বাবার প্রতিধ্বনি অণুরণন তুলছে
এই দেওয়াল সংসারে। 'ওরে খোকা, সময় বড়ো খারাপ।
বেড়ানোর রং গায়ে মেখে নিতে নিতে পৃথিবী এক ধোঁয়ায় মোড়া।
এসব নিয়ে পরে ভাবা যাবে।'

আষাঢ়ে মেঘ ঘন হয়ে এল- এই আগোছালো কামরায়। বৃষ্টি নামল বলে...
কি করবো এখন ? কোথায় দাঁড়াবে সময় ?
মধ্য বয়সের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া এহেন কবি
সইতে পারবেতো ধকল, বৈশাখী-পূর্ণিমার সোহাগী রাত !

**বৃষ্টি হতে পারে  * তীর্থঙ্কর সুমিত**

অবাক !
পাল্টে যাওয়া প্রিয়জনেরা,
সমুদ্রের স্রোত দেখে
লোনাজলের গল্প শোনায়
অথচ...
ওই জলে,
একটা আস্ত না পাওয়ার
উপন্যাস লিখেছিল বাবা
তিস্তা নদীর পাড়ে
তোমার আগুন জ্বালানো কথা
ছাই হয়ে ভেসে গেছে...
আকাশে কালো মেঘ
বৃষ্টি হতে পারে ।

**তাবাকোশি * অমিত কাশ্যপ**

তাবাকোশিতে চাঁদ ওঠে, এমন মস্ত
তাকাই, ঠাকুরনগর থেকে বনগাঁ
সারারাস্তা মফস্বল ঝুলে আছে
চাঁদের আভা, মনকেমন করা এক

দার্জিলিং থেকে ম্যাল, নিচু বাড়িগুলোর ভেতর
উঁকি দিচ্ছে মেঘ, এখন অফিস খুলে যাচ্ছে সব
আহ্লাদে মোমো'র গন্ধ, গুরুং বস্তি দেখেছেন
হাতে বোনা সোয়েটার ভাবতে সোজা-উল্টো

আবার চাঁদের কথা উঠতে শহর আসে
আবাসনের মাথায় অফুরন্ত জলের ভাণ্ডার
চাঁদ পড়ে, সৌন্দর্যের কত এলোমেলো কথা
হু হু ট্রেন মফস্বল মাড়িয়ে মাড়িয়ে যায়

# গ ল্প মা লা ৩

---

**শেষ অভিলাষ * মনন দাস**

মাধুরীর কথা :

এই মনোহর উদ্যান শোভিত নদী-সৈকতাবাসে আজ আমাদের শেষ আনন্দ-যাপন। উদ্যান তো নয়, যেন একটুকরো বনভুমি! তার মাঝে-মাঝে কয়েকটি কটেজ। যেখানে আমরা এসেছি, যাপন করেছি সারা দিন, ফিরে গেছি সন্ধ্যায়। কোথা থেকে এসব 'বুক' করা হয় কে জানে ! ওসব অরিন্দমের ব্যাপার। শহর থেকে ট্রেনে এসে বড় এক লঞ্চে নদী পেরিয়ে এখানে প্রথম যেদিন অরিন্দম আমাকে নিয়ে এসেছিল, সেটা বছরখানেক আগে। সেদিন ছিল আজকের মতই ফাল্গুন মাসের কোনো এক দিন, এমনই শরীর তপ্ত করা বাতাস ছিল, আর সে বাতাসে ছিল নানা গাছে-গাছে ভরে থাকা মুকুলের সুবাস ! শরীরে সঞ্চারিত করছিল কেমন এক মাদকতা !

লঞ্চ থেকে নেমে সাইকেল-রিক্সায় আসতে হয় কিছুটা পথ, রোদের অছিলায় রিক্সাওলাকে বলেছিল হুড তুলে দিতে। রিক্সাওয়ালা আরও সমঝদার, সামনের পর্দা ফেলে দিয়েছিল, তখন শুরু অরিন্দমের পাগলপনা, গাঢ় চুম্বন-সহ শরীরের আনাচেকানাচে - আঃ, অরিন্দম জানে কিভাবে খেলতে হয়, খেলার আগে কিভাবে তৈরী করতে হয় জমিন....কটেজে ঢুকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে-করতে খেলতে-খেলতে অরিন্দম হিসহিসে গলায় বলেছিল - আজ আমাদের হনিমুনের রিহার্সাল, আসলটা হবে সুইজারল্যান্ডে.....আমার প্রতিহত করার শক্তি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছিল, আমি অভিলাষিতা হয়ে উঠছিলাম....

এই বনভূমে, এই নিভৃতাবাসে অদ্যই শেষ দিনযাপন। আমারও, অরিন্দমেরও। অবশ্য দুজনের দুভাবে। হয়তো-বা ছেদ জীবনের ? অরিন্দম, আমি তোমাকে যেতে দেবোনা তোমার কাঙ্খিত স্বপ্ন-পথে।

ওই যে একটু দূরে তিনতলা মেন বিল্ডিং এর নীচে রিসেপশনের খাতায় প্রথম যে দিন তুমি অমৃত রায় নাম লিখেছিলে...

জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ওই যে ওই তিনতলা লজ্, ওখানে অনেক ঘর। নানান মাপের, নানা বিলাসিতার, কিন্তু তুমি এসেছিলে এই কুঁড়েঘরে। এখানে ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকটি মাত্র কটেজ। কোনোটার নাম যুথিকা কুঞ্জ, কারো বা নাম কামিনীকুঞ্জ, কেউ বা গোলাপ বাগ...এগুলি নাকি হনিমুন কটেজ ! যদিও আমাদের জন্য হনিমুন রিহার্সাল কটেজ - মানে অরিন্দম বলেছিল - প্রথম দিন, আসল হনিমুন হবে সুইজারল্যান্ডে - তারপর অবশ্য আর বলেনা। নামে কটেজ, কিন্তু অন্দরে অঢেল বিলাসিতা ! এখানে এক-একদিন এক-এক কুঞ্জে দিনযাপন ! তুমি পারও বটে অরিন্দম ! অদ্য শেষ দিনযাপনে আমি তোমাকে অঢেল দেবো, উজাড় করে দেবো, এমনটি আমি কখনও দিইনি, তুমিও জীবনে কখনো পাওনি।

জানি না আর কেউ তোমাকে....

.....আজ তি - ন - মা - স পর....নির্লজ্জের মতো ফোন করেছিলাম... আর এক দিন, মাত্র একদিন, তারপর আর না... পয়লা ফাল্গুন, বর্ষপূর্তি হোক... শেষ অভিলাষ আমার, তারপর ভুলে যাবো...

তিন মাস আগে অরিন্দম বলেছিল - বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাছাড়া এত বিয়ে বিয়ের কি আছে ! জীবনে চলার পথে কত কিছুই তো ঘটে, সব কি মনে রাখতে হয় ! কোম্পানি আমাকে দুবছরের জন্য আমেরিকা পাঠাচ্ছে, এখন অন্য কিছু ভাবার সময় নেই। জীবনটা কোন পথে যাবে তার ঠিক নেই ! .... আজ আমি উচ্ছল হব, উজ্জ্বল হব বিদ্যুতের মতো। লঞ্চে আসার সময় সারাক্ষণ উচ্ছ্বসিত হয়ে ছিলাম। অরিন্দম লঞ্চের গেটের কাছে হেলান দিয়ে দাঁড়াতে ভালবাসে, আমি হাসিতে খুশিতে ওকে

বারবার ওকে প্রায় জড়িয়ে ধরছিলাম।

অরিন্দমের সাথে আলাপ বইমেলায়। বই কিনতে তো নয়, মেলায় ঘুরতে আর খেতে গিয়েছিলাম আমি অনিন্দিতা আর চৈতালী, পাপড়ি-চাট খেতে খেতে পাশে দাঁড়িয়ে অরিন্দম বলেছিল - আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি !

- গায়ে পড়ে আলাপ করার পুরোনো পচা কায়দা ! - আমি বলেছিলাম, অনিন্দিতা আর চৈতালী খুব হেসেছিল।

- তাই ? কিন্তু আমি আপনাকে দেখেছি সেক্টর ফাইভে।

- একটা আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লেন।

- হয়তো তাই - বলে সরে গিয়েছিল অরিন্দম। কিন্তু ঠিক খুঁজে নিয়েছিল অটো স্ট্যান্ডে। লাল টুকটুকে গাড়িটা পাশে দাঁড় করিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলেছিল - এই যে ম্যাডাম - আমি একপলক দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম.... কিন্তু অরিন্দম আমাকে ঠিক আবদ্ধ করেছিল জালে, আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল...কিন্তু এবার সব শেষ....অমৃত রায় ! তুমি চলে যাবে অনেক দূরে.... একা ? তা কি হয় ? আমি তোমার সঙ্গ ছেড়ে দেব ? না, অমৃত রায়, আমরা দুজনে একত্রে চলে যাব অমৃতলোকে....

এখানে ঢুকেই অমৃত-অরিন্দম ঢুকে পড়েছে স্নানঘরে। আমিই প্রথমে ঢুকে ওকে স্নানঘরে ডেকে নেবো ভেবেছিলাম, শুরু করব আজকের চরমতম ভোগবিলাস, কিন্তু.... ঠিক আছে, আমি জেনে ফেলেছি তোমার দুর্বলতাগুলি, আমার শরীরে আছে অনেক অস্ত্র, তুমি নিস্তার পাবেনা।

স্নান শেষ করে আমি যখন স্নানঘর থেকে বের হলাম, দেখলাম অরিন্দম পুরো পোষাক পরে সেজেগুজে বসে আছে। আমি অন্যরকম আশা করেছিলাম, ভেবেছিলাম ও হ্রস্বতম একটুকরো আলগা পোষাকে শুয়ে থাকবে। কিন্তু হাতঘড়ি দেখে তাগাদা দিয়ে বলল - দশটা বেজে গেল, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নে, আজ আমরা ডাইনিং হলে ব্রেকফাস্ট করব। তারপর বাইরে বেরিয়ে গোলাপ ফুলবনের শোভা দেখতে লাগল। অগত্যা তাই করতে হলো।

খুব বেশি লোকসমাগম এখানে হয় না। ভাড়াটা অনেক বেশি। অনেক বেশি টাকা নিয়ে এরা অনেকটা নির্জনতা বজায় রেখে খরিদ্দারকে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য দেয়। তাও আবার অনেকে ঘরে খাবার আনিয়ে নেয়। আমরাও এতদিন তাই করেছি, কিন্তু আজ ডাইনিং হলে। অল্প কয়েকজন দূরে দূরে, ফাঁকা ফাঁকা টেবিলে বসে। অরিন্দম জানলার ধারে একটা টেবিলে বসে নদীর শোভা দেখতে দেখতে খাবারের অর্ডার দিতে লাগল।

এরপর ও বলল – চল্, বনে-বনে বাগানে-বাগানে একটু ঘুরে বেড়াই। এতদিন আসছি, ভাল করে বেড়ানোই হয়নি।

বাগানের প্রান্তে একটা সুইমিং পুল আছে, বিশেষ কেউ যায়না। যেদিন কথায় কথায় অরিন্দম জেনেছিল আমি সাঁতার জানি, সেদিন ওখানে অরিন্দমের ইচ্ছায় আমি একদিন সুইমিং কস্টিউম পরে সাঁতার কেটেছিলাম। আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম – দু'জনে জলবিলাস করব তো ?

- ওটা আর এ জীবনে হবেনা, আমি সাঁতার জানিনা - অরিন্দম বলেছিল। অতএব অরিন্দম রঙিন ছাতার নীচে বসে ঠান্ডা বিয়ার খেতে খেতে উপভোগ করেছিল আমার বিভিন্ন সাঁতার-মুদ্রা !

আজ ঘুরে বেড়ানোর কথায় আমি উত্তেজিত হলাম, তাহলে দেখাব আজ খেল্, বললাম - সুইমিংপুলে যাবি ?

- না, এমনি ঘুরব।

ঘুরতে ঘুরতে আমরা দেখলাম, নির্জনে একটা দোলনা সঙ্গীহীন বিমর্ষ স্ট্যাচু হয়ে ঝুলছে। ও দোলনাটা ঈষৎ দুলিয়ে দিয়ে বলল - আয়, বোস্, তোকে দোল দিই। পিছনে গিয়ে ও দোল দিতে লাগল, আমি হাসতে হাসতে নানা উত্তেজক শব্দ করতে

করতে দুলতে থাকলাম। অরিন্দম দোলনার আসনটা ঠেলে ঠেলে দোল দিতে লাগল, একটুও আমার শরীর স্পর্শ করল না।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে এলাম নদীতীরে। ফুলে-ফুলে সুশোভিত বাগান, সারি-সারি বৃক্ষেরা মঞ্জরীর ভারে ভারাক্রান্ত। তাদের সৌরভে আলোড়িত বসন্তের উষ্ণ বাতাস। বাঁধানো ঘাটের কাছে এসে আমরা দাঁড়ালাম। ঘাটে বাঁধা ছইওলা নৌকা, রঙের আলপনায় সুন্দর রঙিন ! মাঝি ডাকল - আসুন বাবু, একটু ঘুরিয়ে আনি।

- না, না, - সভয়ে বলল অরিন্দম।

- ভয় নেই বাবু, এ হোটেলের নৌকো, আমরা হোটেলের দক্ষ মাঝি, উটকো নৌকো এখানে ঘেঁষতে দেওয়া হয়না। তাছাড়া আপনাদের জ্যাকেট পরিয়ে দোবো। আপনারা সব হোটেলের ভি আই পি বোর্ডার, আপনাদের জীবনের জন্যে অনেক দায়িত্ব।

অতএব আমরা জ্যাকেট পরে নিশ্চিন্তে নৌকায় উঠলাম। অরিন্দম ছইয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে উদাস দৃষ্টি ভাসিয়ে দিয়েছে দূরে। আমি ছইয়ের ভেতর ঢুকে বসলাম। বুঝলাম অরিন্দম আর মাখামাখি করতে চাইছেনা। আমার অনুরোধে এসেছে, কিন্তু ওইটুকুই, কোনোরকমে এড়িয়ে দিনটা কাটিয়ে দিতে চায়। ঠিক আছে অমৃত-অরিন্দম ! আমিও এসেছি আজ শেষ অভিলাষে, সেটা মাখামাখি নয়....

ঘুরেফিরে ঘাটে ফিরতে প্রায় বেলা দুটো।

- চল্ চল্, লাঞ্চ করে নেওয়া যাক, খিদেয় পেট চুঁই-চুঁই করছে।

লাঞ্চ করে এসে জামা-প্যান্ট না খুলেই অরিন্দম শুয়ে পড়ল, বলল - বড্ড টায়ার্ড লাগছে, কোন ভোরবেলা উঠেছি ! - বলতে বলতে ঘুমিয়ে নাকি ভান করে পড়ে রইল।

এরপর তো আর....অতএব আমিও শুয়ে-শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলাম। প্ল্যান তো নিখুঁত করাই আছে, অতএব....

বিকেল গড়িয়ে গেল, অরিন্দম উঠল, টয়লেটে গেল, মুখে হাত ধুয়ে এলো। বলল- তৈরি হয়ে নে।

লঞ্চঘাটে আসতে আসতে সন্ধে। লঞ্চ দাঁড়িয়েই ছিল, এত বড় লঞ্চে কয়েকজন মাত্র মানুষ ছড়িয়ে-ছিঠিয়ে বসে। অরিন্দম তার অভ্যাসমতো ওঠার মুখে লোহার খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, আমি পাশে রেলিংএ ভর দিয়ে দাঁড়ালাম।

নিজেকে প্রস্তুত করছিলাম। আর মাত্র দুমিনিট, মাঝ-নদীতে লঞ্চ পৌঁছলে সামান্য একটু ঠেলা – ডুবতে-ডুবতে ভাসতে ভাসতে অমৃত রায়ের ভেসে যাওয়া - শেষ ডুব দেখতে দেখতে মানুষজনের চেঁচামেচি ছুটে আসা - তখন আমি ঝাঁপ দেব, সুইমিংপুলের সামান্য সাঁতার এই স্রোতে আমার কোনো কাজে লাগবে না, আমি ডুবব। আমরা দুজনে চলে যাব...

লঞ্চ এখন মাঝ-নদীতে, আমার হাত পা কাঁপছিল, ঘেমে-নেয়ে একাকার আমি অরিন্দমের পিঠে হাত রাখলাম। অরিন্দম ফিরে তাকাল, বলল – কি ?

আমার চোখ ভিজে গেল, - কিছু না, - বললাম আমি, অরিন্দমের পিঠে মুখ রেখে চোখ মুছলাম।

- সকালে দেখা হওয়া থেকে শুরু করে তুই এত হাসছিলি, এত উথলে-উথলে উঠছিলি, কিন্তু আমি দেখছিলাম সব ভুয়ো, শুধুই কান্না তোর বুক জুড়ে, সারাদিন ধরে চেপে রাখা কান্না দেখতে-দেখতে আমি এত কষ্ট পাচ্ছিলাম ! –

দূরে অন্ধকারে কোথায় দৃষ্টি ভাসিয়ে অরিন্দম বলল - বুঝতে পারছিলাম ভালবাসা, ওটা ডাউনলোড হয়ে কোথায় save হয়ে আটকে গেছে বুকের মধ্যে। তোকে ছাড়তে পারব নারে মধু !

---

**মনন দাস – র বইঃ**

**উপন্যাসঃ**

মনভূমি

মন এক উষ্ণ প্রস্রবণ

ঝলমলি

ছুট

গোবু গোবিন্দ

**গল্প সংগ্রহঃ**

অন্য স্বাদ

পঞ্চশ্বর

গল্প পঞ্চক

জীবন যাপন

গ্রাস

মানুষ মানুষীর গল্প

**কিশোর উপন্যাসঃ**

রাজু নারাণের কীর্তি

**ছড়ায় গল্পঃ**

আটটা ঠাট্টা

**কবিতাঃ**

বন সবুজের মন - কবিতা সংগ্রহ- প্রথম খণ্ড

স্থাবর অস্থাবর - কবিতা সংগ্রহ- দ্বিতীয় খণ্ড

White Flowers

**প্রাপ্তিস্থান – লিপিকা**

**৩০/১ এ, কলেজ রো, কোলকাতা ৯**

**অনুপকুমার আচার্য-র**

সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ

**জন্মান্তরের কবিতা**

সৌরভ গ্রন্থপ্রকাশ : বালি, হাওড়া

কবির অন্য দু'টি কাব্যগ্রন্থ

**কবি নয় লোকটা**

বিশ্বজ্ঞান, ৯/৩ টেমার লেন, কল-৯

ই-বই পড়ার জন্য এখানে ক্লিক করুন

https://archive.org./details/Kabi Noy Lokta

**আর এক অন্নদাস**

কারুলিপি : ১৮ডি টেমার লেন

কলকাতা - ৯

শূলপাণি শর্মার

ব্যঙ্গাত্মক ছড়ার বই

**ফুসকুরি**

দৌড় প্রকাশনা কল - ৭০০১২৭

ই-বুক পড়ার জন্য এখানে ক্লিক করুন

https://archive.org./details/Fuskuri

**নীল খামে লেখা চিঠি * অনুপম বিশ্বাস**

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। পুরনো কাঠের জানালার ফাঁক দিয়ে ঢুকছে রোদ। জানালার পাশে বসে নীলা একটা নীল খাম খুলছে ধীরে ধীরে। এই খামটা সে পেয়েছে আজই, তার বাবার পুরনো বইয়ের তাকে রাখা একটা ডায়েরির ভেতরে।

বাবা — বিভাস সেন, মারা গেছেন বছর দুই আগে। শহরের এক নামী স্কুলে শিক্ষক ছিলেন। কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ, নীতিবান মানুষ। মেয়ের ওপর তাঁর আদরের চেয়ে নিয়মানুবর্তিতা ছিল বেশি। নীলার শৈশব কেটেছে বাবার নিয়মের ছায়ায়। মা ছিল না। মারা যান নীলার মাত্র চার বছর বয়সে।

নীলার মনে পড়ে, ছোটবেলায় সে একটিবার পুতুল ভেঙে ফেলেছিল। বাবা তাকে একটা কথাও বলেননি, শুধু বলেছিলেন, “জীবনের মতো খেলনারও যত্ন নিতে শেখো।” সেই কথা আজও তার কানে বাজে।

ডায়েরির পাতাগুলো হলুদ হয়ে গেছে। ডায়েরির ভেতরে রাখা নীল খামটা ছিল সময়ের হাত থেকে লুকিয়ে রাখা কোনো স্মৃতির মতো। খামের ওপর লেখা —

"নীলার জন্য"

তারিখ: ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

সে সময়টা ছিল নীলার কলেজ শেষ করে চাকরির খোঁজ শুরু করার সময়। বাবা তখনও কর্মরত, বয়স হয়ে গেলেও অবসরে যেতে চাননি। চিঠির খামটা খুলতেই ভেতরে একটা হাতের লেখা চিঠি।

“প্রিয় মেয়ে নীলা,

এই চিঠিটা যখন তুমি পাবে, হয়তো আমি থাকব না। অথবা হয়তো তুমি নিজেই একদিন খুঁজে পাবে এটা — আমার পুরনো ডায়েরির ভেতর। তুমি যখন ছোট ছিলে, আমি জানতাম, আমি তোমার কাছে রহস্যময় এক মানুষ। আমার মুখে হাসি ছিল না, গল্প ছিল না, পিঠে হাত ছিল না। অথচ তুমি আমাকে ভালোবাসতে। আমি বুঝি নি তখন — তুমি কতখানি ভালোবাসা চাও শুধু আমার কাছ থেকে। আমি ভাবতাম, শাসনের মাধ্যমেই ভালোবাসা দেখাতে হয়। ভুল ছিল।

তোমার মা — মেঘলা — চলে যাওয়ার পর আমি আর কাঁদিনি। ভেবেছিলাম, তুমি কাঁদলে তোমার চোখের জল মুছবো, কিন্তু নিজে কাঁদলে কে মুছবে ? আমি নিজেকে পাথর করে ফেলেছিলাম, যাতে তোমার জন্য পাহাড় হতে পারি। তুমি যখন ক্লাস টু-তে পড়ো, একবার হ্যান্ডরাইটিং কম হওয়ার কারণে তোমাকে পুরস্কার দেওয়া হয়নি। তুমি সেদিন খুব কেঁদেছিলে। অথচ আমি কিছু বলিনি। কিন্তু জানো, রাতের বেলা তোমার ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি তোমার লেখা কাগজটা নিয়ে বসেছিলাম, বারবার পড়ছিলাম — কত সুন্দর করে তুমি “মা” লিখেছিলে ! আমি শুধু চেয়েছিলাম তুমি শক্ত হতে শেখো, যাতে ভবিষ্যতের দুঃসময় তোমাকে না ভাঙতে পারে। আজ বুঝি — শক্ত হওয়ার চেয়ে মানুষ হওয়া বেশি জরুরি। তোমার বন্ধুরা যখন পিকনিকে যেত, আমি যেতে দিইনি। বলেছি, ‘সময় নষ্ট হয়।’ কিন্তু এখন জানি, জীবনের আনন্দগুলো সময় নয়, স্মৃতি হয়ে ফিরে আসে। আমি তোমার স্মৃতিতে আনন্দ রাখিনি, রেখে গেছি অনুশাসন। তুমি বড় হয়ে গিয়েছ। এখন নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পারো। আমি গর্ব করি তোমার চেষ্টার ওপর। তবে আজ একটা কথা বলি — যদি কোনোদিন তুমি মায়ের মতো কাউকে পেয়ে যাও, যাকে নিঃশর্তে ভালোবাসা যাবে, তাকেও যেন আমার মতো দূরে ঠেলে দিও না। তাকে জড়িয়ে ধরো। মেয়ে, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসতাম। শুধু বলতে পারিনি।

তোমার বাবা, বিভাস সেন”

চিঠিটা পড়ার সময় নীলার চোখ ভিজে ওঠে। সে জানত, বাবার কঠোরতার পেছনে ভালোবাসা ছিল। কিন্তু এমন একটা চিঠি... যা সে নিজের জীবনের সবচেয়ে গভীর অনুভূতির দলিল হিসেবে রেখে দিতে পারবে। চিঠির শেষ অংশে একটা পেনসিল লেখা দেখা গেল —

"এই চিঠিটা যদি একদিন পাওয়া যায়, তবে জানবে — আমি চেয়েছিলাম তোমার জন্মদিনে এটা দিতে, কিন্তু পারিনি।"

নীলার জন্মদিন ২৭ সেপ্টেম্বর। সে-বছর সে ছিল অন্য শহরে, এক বন্ধুর সঙ্গে চাকরির ইন্টারভিউতে গিয়েছিল। সে নিজের চোখ মুছে জানালার বাইরে তাকায়। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। একরাশ নরম আলো এসে বিছানায় পড়েছে। বাতাসে যেন বাবার কণ্ঠস্বর ভেসে বেড়ায় — "মেয়েটা তো আমার মতোই জেদি, তবু ওর চোখে মায়ের ছায়া।"

সে উঠে দাঁড়ায়। ডায়েরির মধ্যে চিঠিটা আবার রাখে। এবার খামটাও রেখে দেয় যত্ন করে, যেন বাবার একটা চিহ্ন রয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে ফোনটা তোলে। মেঘলা নামে একটি নম্বরে কল করে। ওপাশে উত্তর আসে, "হ্যালো ?"

নীলা বলে, "তুই কি একটু আসবি আমার বাসায় আজ ? আমি তোকে বাবার একটা লেখা দেখাতে চাই। আজ ওঁর জন্মদিন।"

রাত দশটা। নীলা আর মেঘলা দু'জনে বসে আছে চুপচাপ। মাঝখানে রাখা একটা মোমবাতি জ্বলছে। বাবার একটা পুরনো ছবি রাখা টেবিলের ওপর। পাশে রাখা নীল খাম।

নীলা বলে, "তোকে জানতাম বলেই প্রথম তোকে দেখালাম এটা। বাবা বুঝেছিল, আমি তোকে ভালোবাসি। আর তুই আমার জীবনে সেই ভালোবাসার রঙ এনে দিয়েছিস, যা বাবা বলতে পারেনি, লিখে গেছে।"

মেঘলা চিঠিটার দিকে তাকায়, চোখে জল।

নীলা বলে, "চিঠির শেষ লাইনে বাবা লিখেছেন, যাকে ভালোবাসবি, তাকে যেন দূরে ঠেলে দিস না। আমি তাই তোকে জানাতে চাই — আমি তোকে ভালোবাসি, মেঘলা।"

এক মুহূর্ত স্তব্ধতা। তারপর মেঘলা ধীরে হাতে রাখে নীলার হাতের ওপর।

কোনো কথা হয় না, শুধু বাইরে বৃষ্টি পড়ে — শান্ত, শান্ত এক ধারা।

---

**আয়না** * **পূর্বিতা পুরকায়স্থ**

একটা ঘটনা ভোলানাথের আয়নার মত স্বচ্ছ মনটাকে চুরচুর করে ভেঙ্গে দিয়েছে। শান্তি নষ্ট করে দিয়েছে চিরতরে। ও এখন আর ঘুমোতে পারে না। চোখটা বুজলেই দৃশ্ টা বুকে চেপে বসে। ওর দমবন্ধ হয়ে আসে। ধড়মড় করে উঠে বসে বিছানায়। ভোলা স্পষ্ট দেখতে পায়, লাল রংয়ের শাড়িটা জলে ফুলে ফুলে উঠছে। নথ পড়া গোল মুখে বড় করে পড়া সিঁদুরের টিপ। পায়ে নূপুর। ঢলঢলে মুখটা যেন সাক্ষাৎ মা দুর্গার। বিসর্জনের জন্যেই কি কেউ সাজিয়েছিল ওঁকে ? না কি নিজেই শেষ সাজে বিসর্জনকে ডেকে নিয়েছিলেন ? এই ধাঁধার কোন কূলকিনারা আজো ভোলা করে উঠতে পারে নি। সেদিন আর কেউ হয়ত দেখতে পায়নি, কিন্তু ভোলা দেখেছিল একটা আশ্চর্য জিনিস, পুকুর থেকে আকাশ অব্দি একটা আলোর রশ্মি । একটা ছায়াপথ। স্বর্গে যাবার। মনে মনে ভেবেছিল, এমন সোনার প্রতিমার স্থান তো স্বর্গেই হবে। ওখান থেকেই নেমে এসেছিল মধুপুরের হারান হালদারের বাড়ির একমাত্র ছেলের বউ ।

পুরো গ্রাম আলো করে ছিল ঐ বউ তার রূপ ও গুণ নিয়ে। কিন্তু হালদার বাড়ি তার মর্যাদা দিতে পারে নি । শুনেছিল, হারান হালদারের ছেলে সত্য নাকি নানারকম নেশায় আসক্ত ছিল। বেশিরভাগ সময় সে বাড়ির বাইরে থাকত। স্ত্রীর প্রতি তার যত্ন বা মনোযোগ

একেবারেই ছিল না। এবং এ নিয়ে তার বাড়ির লোকেদেরও কোন মাথাব্যথা ছিল না। এইসব কথা মনে পড়লেই ভোলার মনটা উদাস হয়ে যায়। ও ভাবে এমন স্নিগ্ধ ছায়ায় মোড়া রূপকেও হেলাফেলা করার মত লোক তাহলে আছে এই পৃথিবীতে !

ভোলা সত্য হালদারেরস্ত্রীকে প্রথম দেখেছিল, ওঁদের বাড়িতে কালীপুজোর দিন। সেদিন পুজোর পর একটার পর একটা শ্যামাসঙ্গীত গেয়ে যাচ্ছিলেন ভদ্রমহিলা। ভোলা নিজে কীর্তনীয়া বলে গান বাজনা একটু আধটু বোঝে। জীবনে ও অনেক গান শুনেছে ও শুনিয়েছে কিন্তু এত সুরেলা ও দরদী গলায় গান আগে শোনেনি। ভদ্রমহিলার কণ্ঠ থেকে সেদিন ভক্তিরস এমন ভাবে বইছিল যে ওখানে উপস্থিত সবার চোখে সেদিন জল এসে গিয়েছিল। আর ভোলাকে সেই থেকে এক মায়াময় ভাললাগায় ভরিয়ে রেখেছিল। কোন মানুষের জন্য এ মন অনুভূতি ওর জীবনে ঐ প্রথম।

সেদিনের পর সেই ভদ্রমহিলাকে কখনো দেখতে পেলে ভোলা ঈশ্বর দেখার মত চমকে উঠে বিনম্র শ্রদ্ধায় নত হত, আর মনে-প্রাণে ওঁর কুশল কামনা করত। কিন্তু ওঁর বিষাদ মাখানো দু'টো চোখ দেখে ওর মনে হত এ নিশ্চয়ই অভিশপ্ত কোন পরী। মর্ত্যে প্রারব্ধ কাল কাটাতে এসেছে।

ভোলার ত্রিশ বছরের জীবনে তখন অব্দি ভাললাগা কিংবা ভালবাসা হয়ে কোন নারী আসেনি। কিন্তু এবার যে ভাললাগায় ওর মন ছেয়ে আছে, তাকে ভালবাসা বলে ভাবতে ভোলার অপরাধবোধ হয়। ও বরং তাকে পুজো বলে ভাবতে স্বস্তি পায়। সত্য হালদারের স্ত্রীকে দেখার আগে অব্দি ভোলা নিজের অস্তিত্বকেই কোনদিন অনুভব করতে পারে নি। প্রকৃতির খেয়াল ও নিয়মের সাথে ও মিশে থাকত। বুক দিয়ে আগলে রাখত ওর আশপাশের গাছপালা ও পশু পাখীদের। ওর বুকের ভেতর যে টলটলে জলের ছোট্ট পুকুরটা আছে, তাতে তাই অল্পতেই ঢেউ ওঠে। মনটা চলকে ওঠে।

ভোলার পৈতৃক ভিটে মধুপুরে হলেও, পেশার খাতিরে ওর গতিবিধি আশেপাশের পাঁচ ছয়টা গ্রাম গঞ্জ জুড়ে বিস্তৃত। যেখানে যেদিন হাট কিংবা মেলা বসবে ও ঠিক সেখানে সেদিন পৌঁছে যাবে। একসময় ভোলা একটা কীর্তনের দল গড়েছিল কিন্তু পরে তা ভেঙে যায়। যদিও তা নিয়ে ওর কোন দুঃখ ছিল না কারণ ভোলা নিজেও জানত, ও একজায়গায় বসে থাকার লোক নয়। এক দিন না একদিন ঠাঁই নাড়া ও হবেই। তবে সেটা যে এত তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে সেটা ও নিজেও জানত না।

লোকে বলে ভোলার মনে এই বোহেমিয়ান স্বভাব বাসা বাঁধে ওর বোধ হবার আগে থেকে। ওর বয়েস যখন বছর চারেক, তখন ওর মা মারা যান। কিছুদিন পর সৎ মা বাড়িতে আসেন আর সেই থেকে ভোলার ঠিকানা হয় গ্রামের এ বাড়ি ও বাড়ি। এ বাড়িতে যদি কোন জ্যাঠাইমা দুপুরের ভাত খাইয়ে দিতেন, তাহলে ও বাড়িতে কোন কাকীমা রাতের রুটি খাওয়াতেন। ওঁদের মনে হত, আহারে মা-মরা ছেলে। ক্ষিদে পেলে দেখার কেউ নেই। এভাবেই জ্ঞাতি ও পাড়া প্রতিবেশীদের আদরে আহ্লাদে ভোলা বড় হয়ে ওঠে। বড়দের এই অপত্য স্নেহের সঙ্গত দিত প্রকৃতির প্রশ্রয় ও মায়া মমতা । ভোলা এভাবে সবাইকে জড়িয়ে সবার মাঝে বেঁচেছিল । ঘরের টান ছিল না বলেই হয়ত বাইরেটা ই হয়ে গিয়েছিল ওর ঘর।

প্রকৃতির সাথে ভোলার এমন নিবিড় সম্পর্ক ছিল যে ও চোখ বুজে বলে দিতে পারত কোন পাখি কখন বাসা বাঁধবে, কখন বৃষ্টি নামবে, কখন ঝড় আসবে এরকম অনেক অনেক কিছু । যেন প্রকৃতির স্পন্দন ও অনুভব করতে পারত।

এভাবে মধুপুরে প্রকৃতি ও মানুষকে জড়িয়ে ভোলা ভালই ছিল। কিন্তু সেই অপমৃত্যু ওকে যেন এক ধাক্কা দিয়ে গ্রাম ছাড়া করল। ও চলে গেল।



রেখাচিত্র – দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিদিন ফজরের নামাজ শেষে বারান্দায় এসে বসে আলো। আজ বারান্দায় না বসে রান্নাঘরে এলো, এক কাপ চা বানাবে নিজের জন্য।

চায়ের হাঁড়িটা হাতে নিতেই মাথাটা গরম হয়ে গেলো। এতো বছর হয় এই বাড়িতে ও। এই হাঁড়িতে কতো মেহমান আর বাড়ির মানুষের জন্য চা করেছে ! শ্বশুরবাড়িতে প্রথম দিন শাশুড়ি-আম্মা এই হাঁড়িটি ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এই নাও তোমার সংসার। এতে করে প্রতিদিন সকাল-বিকেল চা করবে। তারপর থেকে প্রতিদিন সকাল-বিকেল এই হাঁড়িতে করে ও অনেক চা বানিয়েছে। প্রথমে দুধ জ্বাল দিয়ে তারপর ওতে চা-পাতা, চিনি দিয়ে জ্বাল দিতে দিতে রঙ যখন গাঢ় হয় তখন বাড়ির সবার জন্য ফ্লাক্সে করে ডাইনিং-টেবিলে রাখতে হয়। এক-একজন করে ঘুম থেকে ওঠে আর চা-টোস্ট খায়। এদিকে চুলায় আবার হাঁড়ি চড়ে। ভাত, সবজি তরকারি, মাছ ভাজা, মুরগীর পাতলা ঝোল।

বাড়ির পুরুষেরা গোসল করে গরম ভাত খেয়ে দোকানে যায়। এদের মোটর-পার্টসের ব্যবসা। যাবার সময় বড় টিফিনবাক্সে দুপুরের জন্য খাবারও নিয়ে যায়। আলোর স্বামী সবার বড়। নাম সজল, মেজো কাজল আর ছোট নয়ন। বড়জনের তদারকিতে দোকানগুলো ভালোই চলছে। তিন ভাইয়ের জন্য দু'টি গাড়ি। সকালে বড়জনের সাথে ছোটভাইও যায় দোকানে । মেজোর দোকান দূরে, তাই ও একাই যায়। বাড়ির কাজের প্রয়োজনের জন্য আর একটা গাড়ি বাসায় থাকে।

আলোর পরে আরো দুই বউ এসেছে এই বাড়িতে। তবে ওদের দায়িত্ব কম। শাশুড়ি-আম্মা মেজোছেলেকে বিয়ে দেবার সময়ই আলোকে ডেকে বলেছে, বড়বউ শোনো, তুমি হলে এই সৈয়দ বাড়ির বড়বউ, তোমার দায়িত্ব সবার চেয়ে বেশি। তুমি ছোট বউদের কোন দায়িত্ব দেবে না। ওরা তোমার কথামতোই চলবে, বুঝতে পেরেছো ? কখনো ওদের হাতে সংসারের দায়িত্ব দেবে না, তাহলে ওরা তোমার মাথার উপর চড়ে বসবে। শাশুড়ি-আম্মার কথা মতো আলো আজ পর্যন্ত মেজো আর ছোটবউকে কোন রকম সংসারের কোন দায়িত্ব দেয়নি। ওরা ঘরের মেয়ের মতোই ঘুরে বেড়ায় আর খাবার সময় খাবার টেবিলে এসে বসে।

ট্রিপ্লেক্স এই বাড়িটি আলোর শ্বশুর-আব্বার করা। বিশাল বড় বাড়ি। বাড়ির চারিদিকে বাগান। পিছনে বড় বড় গাছ, ছোট্ট একটা সুইমিংপুল। সুইমিংপুলটা করেছে আলোর বিয়ে পর পরই।

শ্বশুর-আব্বা মারা গেলেন আলোর বড় মেয়ের বয়স যখন তিন আর ছেলেটা সাত মাসের পেটে। বড়ো ভালো মানুষ ছিলেন আলোর শ্বশুর-আব্বা। উনি মারা যাবার পর, আলোর যখন-তখন মনটা কেঁদে উঠতো। সকালে নাস্তার পর শ্বশুর-আব্বার গলায় ডাক শুনতো, বউমা বাজার এনেছি। প্রতিদিন বাজার করা ওনার একটা বড় সখ ছিলো।

কেমন করে একজন কাছের মানুষ অনেক-অনেক দূরে চলে যায় ! আর কখনো তাকে দেখতে পাবে না ! তার কথাগুলো শুনতে পাবে না ! এতো অল্প সময়ের জন্য মানুষ পৃথিবীতে আসে ! মায়া বাড়িয়ে চলে যায় !

এই বাড়ির একমাত্র মেয়ে মিম। আব্বা, আম্মা আর ভাইদের চোখের মণি। হঠাৎ একদিন শ্বশুর-আব্বা মারা যাবার কয়েক বছর আগে মিমের কোন খোঁজ পাওয়া গেলো না ! বান্ধবী আত্মীয়স্বজন সব জায়গায় খোঁজ করা হলো, কিন্তু কোথাও মিমকে পাওয়া গেলো না। শ্বশুর-আব্বা জ্ঞান হারালেন। বাড়ির সবার নাওয়া-খাওয়া বন্ধ। চুলায় আগুন দেবার মতো মনের অবস্থা কারো নেই। সেই সময় একটা আননোন ফোন-কল এলো দিনাজপুর থেকে, শ্বশুর-আব্বার মোবাইলে। তাড়াতাড়ি ফোন ধরলো সজল ।

পরিচয় দিলো না, শুধু বললো, আপনাদের মেয়ে মিম এখন দিনাজপুরে আমাদের কাছে আছে। যদি মেয়েকে অক্ষতদেহে পেতে চান, তাহলে ত্রিশ লক্ষ টাকা নিয়ে আজই দিনাজপুর চলে আসুন। যদি পুলিশকে জানান অথবা আপনারা বাসার মানুষ ছাড়া অন্য

কাউকে জানান, তাহলে আপনাদের মেয়েকে আর পাবেন না। সজল বললো, আমরা এক্ষুনি আসছি। কাউকে কিছুই জানাবো না। ওপাশ থেকে বললো, আজকে রাতে রওনা দিন। সকালে এখানে পৌঁছে, এই নম্বরে ফোন দেবেন। সজল বললো, জ্বি আপনারা যা বলবেন, আমরা তাই করবো, কিন্তু আমার বোনটি যেন ভালো থাকে। আমার বোনের কোন ক্ষতি করবেন না। তাহলে কোন টাকা পাবেন না। ওপাশ থেকে বললো, এতো প্যাঁচাল পারেন কেন ? বললাম তো, টাকা নিয়া আসেন।

মিমকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হলো, কিন্তু ফেরার পর আগের সেই মিম যেন কোথায় হারিয়ে গেলো। সারাক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। আগে মোবাইলে টিকটক বানাতো, এখন মোবাইল স্পর্শ করে না ! কেউ ফোন করলেও ধরে না। একদম নীরব হয়ে গেছে। কিভাবে ওকে ওরা ধরে নিয়ে গেল, জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দেয় না ! ওদের কাউকে চিনতে পেরেছে কী না, তাও বলে না ! চুপচাপ বসে থাকে।

আব্বা, আম্মা আর ভাইদের চোখের মণির যদি এমন অবস্থা হয় তাহলে করো কী ভালো লাগে ? সবাই অস্থির হয়ে পড়লো, কী করলে মিম আবার আগের মতো হবে। আবার হাসবে, সবার সাথে কথা বলবে।

পরিবারের সবাই পরামর্শ করে ঠিক করলো, বিয়ে দিলে হয়তো পেছনের কথাগুলো ভুলে থাকতে পারবে। বিয়ের জন্য ছেলে খোঁজ করতে লাগলো পরিবারের সবাই ।

ধুমধামে বিয়ে হয়ে গেলো মিমের। অনেক আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব সবাইকে দাওয়াত করে খাওয়ানো হলো।

বিয়ের পর আবার মিম ধীরে-ধীরে স্বাভাবিক আচরণ করতে লাগলো। একদিন আলো সাহস করে মিমকে জিজ্ঞেস করলো, মিম, তোমাকে ওরা কিভাবে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো ?

মিম কিছুক্ষণ আলোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর চারপাশটা ভালো করে দেখলো, কেউ আছে কী না। তারপর বললো, এ-কথা তুমি কাউকে বলবে না বলো ?

আলো বললো, বলবো না।

বড়ভাবি, আমি জয়কে ফেসবুক-ফ্রেন্ড হিসাবে প্রথম দিকে কথা বলতাম ম্যাসেঞ্জারে, কিন্তু তারপর আমার প্রতি ওর কেয়ার আর সম্মান দেখে ওকে ভীষণ ভালো লাগতো। ও আমাকে ওর মনের কথাগুলো বলতো। আমাকে ও খুব ভালোবাসে সেটা সব সময় আমাকে অনুভব করাতো। আমিও ওকে খুব পছন্দ করতাম, প্রচন্ড ভালোবেসে ফেলেছিলাম, ভাবি।

জয় একদিন বললো, ঢাকায় আসছে কী একটা কাজে। আমার সাথে দেখা করতে চায়। আমি রাজি হলাম। আমারও ওকে সামনা সামনি দেখার ইচ্ছে ছিলো।

আলো বললো, তারপর ! তুমি তো এসব কথা আমাকে কখনো জানাওনি !

মিম বললো, ভাবি, আমি তোমাকে বলতাম কিন্তু তুমি যদি বড়ভাইকে বলে দাও, তাই বলিনি।

সেদিন ছিলো রবিবার। বাসায় সবাই জানে, আমি কলেজে গিয়েছিলাম। কিন্তু কলেজে না গিয়ে জয়ের সাথে দেখা করতে রমনা পার্কে গিয়েছিলাম।

ওকে দেখে আমার আরো ভালো লাগলো। ও আমাকে বললো, চলো, রমনা-রেস্তোরাঁয় বসি। আমি বললাম, আমার পরিচিত কেউ দেখে ফেললে ? ও বললো, আচ্ছা, তাহলে চল, নিরিবিলি কোন রেস্টুরেন্টে যাই। আমি সায় দিলাম। ও একটা ট্যাক্সি ডাক দিলো। আমরা ট্যাক্সিতে উঠলাম...। তারপর ভাবি, আমার আর কিছু মনে নেই।

কী বলছো !

হ্যাঁ ভাবি, আমার জ্ঞান যখন ফিরলো তখন দেখলাম একটা নোংরা খাটে শুয়ে আছি আমি। আমার হাত, পা আর মুখ কাপড়

দিয়ে বাঁধা !

তুমি এসব কথা ওখান থেকে ছাড়া পাবার পর বলো কেন ? তোমার ভাইয়েদেরও তো জানাতে পারতে !

মিম বললো, ওদের হাত থেকে বেঁচে আসতে পেরেছি, এটাই আমার কাছে অনেক বড়। তাছাড়া ওরা মানুষ খুব জঘন্য। ত্রিশ লাখ টাকা আব্বা না দিলে, ওরা আমার যে কী করতো, তুমি চিন্তাও করতে পারবে না, ভাবি ! জয় ওদের গ্যাংয়ের একজন চুনোপুঁটি। আরো বড়-বড় খারাপ লোক ওদের গ্যাং-এ আছে। আমি ওদের কথা শুনে সব বুঝতে পেরেছি।

তাই নাকি ! আলোর চোখে আতঙ্ক।

মিম বললো, আমার পরিবারের কথা ভেবে আমি তোমাদের কিছুই বলিনি, ভাবি।

ভাবি, আমি সত্যি-সত্যি জয়কে ভালোবেসেছিলাম। মানুষ কেন এমন হয় ভাবি ? মুখোশের আড়ালে একদম অন্য মানুষ ? ও আমার সাথে এমন করতে পারে, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি !

আলো এই পরিবারের একজন। এই পরিবারের সম্মানের জন্য, ভালোর জন্য ও সব করতে পারে। তাই মিময়ের কথাগুলো ও সজলকে কিছুই জানালো না।

আলোর মনে পড়ে গেল, অনেক অনেক বছর আগের কথা। তখন ও দশম শ্রেণীর ছাত্রী। ওর কাছে প্রতি সপ্তাহে একটি করে চিঠি আসতো। নাম-ঠিকানাবিহীন চিঠিগুলো ছিলো হৃদয়-ছোঁয়া ! প্রতিটি চিঠিতে থাকতো আলোকে ভালোবাসার কতো অপূর্ব সুন্দর-সুন্দর অনুভূতির কথা !

ছয় মাস পর আলো বুঝতে পারলো, চিঠি কে পাঠায়। আলোদের গ্রামের বাড়ির পাশের বাড়ি সজলের দাদার বাড়ি। সজলরা ঢাকায় থাকলেও মাঝে-মাঝে গ্রামে আসতো বেড়াতে তখনি আলোকে দেখে সজল। আর ভালোলাগা-ভালোবাসা হয়।

একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে আলো দেখে, সজল দাঁড়িয়ে আছে মাথা নিচু করে। কাছে আসতেই সজল বললো, আমার চিঠির উত্তর দাও না কেন ?

আলো বললো, আপনি তো ঠিকানা ছাড়া চিঠি পাঠান। আর আপনার কাছে কেন আমি চিঠি লিখবো ?

এভাবেই দুজনের কথা চলে। সজল ফিরে যায় ঢাকায়।

আলো লেখে ওর বিয়ের কথা চলছে। সজল বলে আমি আব্বাকে তোমার কথা বলেছি। উনি কয়েকদিনের মধ্যেই দেশে যাবেন আমাদের বিয়ের কথা বলতে।

আলোর সজলের সাথেই বিয়ে হয়ে গেলো। বিয়ের আগের চিঠিগুলো আজও আলো অতি যত্নে আলমারিতে রেখেছে।

আগে বাবা-মায়েরা মেয়ে-সন্তানদের নিয়ে চিন্তা করতেন এই ভেবে যে, অবুঝ মেয়ে কোনো লেখাপড়া না-জানা ছেলের প্রেমে পড়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেললো নাকি ?

অথবা মেয়ে প্রেম করে লেখাপড়ার ক্ষতি করছে কী না ?

কিন্তু এখনকার বাবা-মায়েরা শুধু মেয়ে না, ছেলেদের নিয়েও দুশ্চিন্তায় ভোগেন। ছেলেমেয়েরা ড্রাগ-এ্যাডিক্টেড হয়ে পড়লো কী না অথবা মেয়ে ফেসবুক বা অন্য কোনোভাবে কোনো ছেলের পাল্লায় পড়ে কোনো খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়লো কী না ? মেয়ে ধর্ষণের শিকার হলো কী না ? কোনো ট্র্যাপে ফেললো কী না বন্ধু-বান্ধবরা মিলে ? এখনকার মা-বাবাদের সন্তানদের নিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ নেই।

আলোর মেয়ে বড় হচ্ছে। মেয়ের দিকে তাকালে ওর ভীষণ ভয় হয়। ওর এই নিস্পাপ মেয়ে কী ভালো থাকতে পারবে ? ওকে

কী ভালো থাকতে দেবে এই সমাজ ?

হঠাৎ চায়ের হাঁড়ির দিকে চোখ পড়লো আলোর।

হাঁড়িটাকে একদিকে বাঁকা করে ফেলেছে কে যেন ! তলা কালো কুচকুচে ! ভেতরে পোড়া দাগ ! কে করেছে এই কাজ ? এতো পুরোনো হাঁড়িটাকে কেউ পছন্দ করে না। অনেকে বলেছে হাঁড়িটাকে ফেলে দিয়ে নতুন হাঁড়ি অথবা কেটলি কিনতে। কিন্তু, আলোর এই হাঁড়িটার প্রতি একটা আলাদা টান ! ও কিছুতেই ফেলে দেবে না এটাকে।

পুরোনো জিনিস ও আগলে রাখতে চায়। যেমন চায় সেই সুন্দর ভালোবাসার চিঠির যুগ ফিরে আসুক। ফিরে আসুক ছেলেমেয়েদের সেই নির্মল ভালোবাসা। ভালোবাসুক একে অপরকে নির্ভয়ে, কোন খারাপ মতলবে না, শুধুই ভালোবাসার টানে।



---

**ঠিকানা বদল * প্রভাস কান্তি ভদ্র**

' সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে '....
জন্মেছি এখানে অবিভক্ত বাংলায় - ফরিদপুরে,
বসবাস - আইনজীবী পিতার কর্মসূত্রে টাউনে, রাজেন্দ্র কলেজের কাছে...
দেশভাগ....
তিন কাকার সঙ্গে চার দাদা দিদি এপারে -
অন্য সবাই ওপারে...
তাদের কাছে বেড়াতে এলাম একবার....
আর ফেরা হলোনা,
পাঠিয়ে দেওয়া হলো উত্তরবঙ্গে...
শুরু দ্বিতীয় বসবাস,
চাকুরিরত কাকার কাছে - ইংডং চা-বাগানে...
বাবা-মা এলেন তারপর - তৃতীয় ঠিকানা -
বাটানগরের কাছে, এক কামরার ভাড়া বাড়িতে...
বাবার পসার জমতে-জমতে ক্রমশ দু'কামরা...
চার কামরার ভাড়া বাড়ি, কিন্তু বাড়ি হলোনা...
হলোনা স্থায়ী ঠিকানা....
বাড়ি করার অবস্থায় বাবা বলতেন
শিক্ষা সর্বাগ্রে, দরকার সন্তানদের ভিত শক্ত করা, অযোগ্য সন্তানেরা
সম্পত্তি নিয়ে কাজিয়া করে
বাড়ি বেচে খায়... তাই...
চতুর্থ ঠিকানা...
কলকাতার ভি.আই.পি রোডের কাছে, কেষ্টপুরে...দুকামরার ফ্ল্যাটে,
বন্দী অবসর জীবন...
শয়নঘর থেকে স্নানঘর...
হয়তো শেষ ঠিকানা বদলের অপেক্ষায়....

**অনাহূত * ধ্রুব দে**

শিশির-ভেজা সকালে কখনো দেখিনি তাকে
এমনকি ঘরে ফেরা ক্লান্ত সন্ধ্যার পথেও
দরজার আগল ছুঁয়ে দাঁড়ালে
তবু খুব কি অচেনা ?

খুব যে অজানা তাও নয়,
মনে হয় দূর কোন সরাইখানায়
দেখেছি কখনো
তুষার-মাথায় এসেছিল জাগা না-জাগার রাতে
জমাট ঠান্ডায় কেঁপে উঠছিল
অভুক্ত শীর্ণ শরীর

**কে ছোট কে বড় * ডাঃ সমীর কুমার বেতাল**

কতগুলো ছোট ঘরের পিছনে
অনেকগুলো ছোট ছোট ঘর।
ছোট ছোট ঘরের সব ঘরের
ছোট ছোট জানলা-দরজা।

কতগুলো বড় বড় বাড়ি
বড় বড় রাস্তার উপর
বড় বড় জানলা-দরজা
আকাশ ছোঁয়া সব বাড়ি।

ছোটরা ছোটদের কথা বলে
বড়রা সব বড়দের কথা বলে
কে ছোট বা কে বড়
সকলে তার বিচার করে।

**নিঃশব্দ প্রতীক্ষা * আজারুল আলী**

জানি আসবে তুমি
যে নিরপরাধ অসহায় প্রশ্নেরা শবঘরে শায়িত
তাদের খোঁজ নিতে নিশ্চিত আসবে তুমি।
যে আহত, ক্ষতবিক্ষত প্রতিশ্রুতিরা জীবনহীন শৈত্যবাসে বন্দী
তাঁদের ক্রন্দনরতা কণ্ঠস্বর তোমার কানে নিশ্চিত পৌঁছাবে—
জানি, আসবে তুমি,
এ-মনের অসুখ সারবে আবার।
তোমাকে দেখতে চাওয়ার যে তীব্র আকাঙ্খা
আমার হৃদয়জুড়ে দুরারোগ্যের রূপ ধারণ করেছে !
তোমার "খ্যাল রখা করো অপনা" ধ্বনির পরশ—
আমার হৃদয় জুড়ে আবার প্রশান্তি আনবে— জানি।

তুমি আসবে, তোমার সুধাভরা চাহনি,
মায়াবী চোখ— আমার হৃদয়ের রক্তক্ষরণ থামাবে আবার।
তোমার স্নিগ্ধ স্পর্শের ছোঁয়া—
আমার আত্ম-যন্ত্রণার গতি রোধ করবে ঠিক।

জানি, আসবে তুমি।
তোমার ভালবাসার ছোঁয়ায়
আবার জেগে উঠবে হৃদয়ের প্রতিটা মৃত কোণ,
তোমার ফিরে আসা হবে আমার আত্মার ঋতু-পরিবর্তন ;
ঠিক যেমনভাবে হেমন্ত শেষে বসন্ত আসে।

জানি, তুমি আসবে—
হয়তো হঠাৎ কোনো এক বিকেলের নরম আলো হয়ে,
হয়তো নিঃশব্দ কারও পায়ে হেঁটে আসা এক চেনা ছায়া হয়ে।
আমি বসে থাকবো
অপেক্ষার ছায়ায়, হৃদয়ের বারান্দায়—
তোমার পায়ের শব্দে আবার দুলে উঠবে আমার নীরব সংসার।



রেখাচিত্র – সেঁজুতি গোস্বামী

# ভ্র ম ণ

---



## রঙ্গীত নদীর ধারে

অভিষেক দাস

প্রতি বছর পুজোতে আমরা বাঙালিরা; বিভিন্ন প্যান্ডেলের রকমারী সাজে, প্রতিমার সৌন্দর্যে, উত্তাল মানুষের ভিড়ে ঘুরে বেড়াবার আনন্দ নিয়ে মেতে থাকতে বেশি ভালোবাসি। এই হল বাঙালির পুরাতন ধর্ম, তবে এই নিয়ম কিছুটা ভেঙে যদি এই পুজোয় কলকাতার সুসজ্জিত জাঁকজমক থেকে দুরে, কোথাও একটু নিরিবিলিতে নিজের ছুটির দিনগুলি কাটাতে চান, তবে অনেক খরচ করে, বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নেই।

আপনারা অনেকে দার্জিলিং নিশ্চয়ই গেছেন; তবে পাহাড়ের চূড়ায় অনেকেই য়াওয়ার প্ল্যান করে, কিন্তু পাহাড়ের কোলে বসা কিছু জায়গা থেকে যায় একটা অফ-সাইড স্পট হয়ে।

দার্জিলিং শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূর ও ১.৫ ঘন্টার রাস্তা, ছোট রঙ্গীত নদীর গ্রাম, পাহাড়ের কোলে, বিজনবাড়ি। উঁচু ও সুন্দর পাহাড়ের গা থেকে ভেসে আসা নদীর জলে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় দেখার যে উপলব্ধি, তা এক বাকরুদ্ধ করার মত দৃশ্য। পাঁচ জনের আমাদের দলের ঘুরে বেড়ানোর ভীষণ ভাল অভিজ্ঞতা ছিল। ছিলাম একটি কটেজের মত সুন্দর জায়গায়, যেখানে দোতলার মতো ছিল আমাদের থাকার জায়গা। একটি ঘরে কম পক্ষে ছয় জন থাকার মত জায়গা। সব থেকে সুন্দর জিনিস যেটা ছিল, দোতলার ঘরের ছোট্ট ব্যালকনি থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে স্রোত বয়ে চলা রঙ্গীত নদী ও তার ওপারে পাহাড়ের পদস্থলে জঙ্গল। থাকা-খাওয়ার কোন সমস্যা নেই, হোমস্টের মালিকরা, সব খেয়াল রাখেন। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, বিকেলের স্ন্যাকস, ও রাতের খাবার সব কিছু একদম ঘরোয়া। সেই হোমস্টেতে একটি বেশ বড়সড় পুল আছে, যা দিনের বেলায় এই এলাকার অল্পবয়সীদের মাঝে বেশ প্রিয় ও মজার জায়গা। তারা বন্ধুরা সব আসে ও মজা করে স্কুল-ছুটির পর সময় কাটায়। ২ রাত ও ৩ দিনের জন্যে থেকেছিলাম, দেখার হয়তো অনেক সাইটসিয়িন নেই, তবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা, শহরের আলো-আওয়াজ থেকে দূরে একটি ভীষণ অনন্য অনুভূতির সঙ্গে কয়েক দিন কাটিয়েই আপনি জায়গাটার প্রেমে পড়ে যাবেন। আমাদের পাঁচ জনের থাকা, খাওয়া ও বেড়ানো; সব মিলিয়ে খরচ মাত্র ১৫,৬০০/- লেগেছে। প্রকৃতির মাঝে কাটানোর জন্য কিছুটা সময় ও এমন অল্প খরচ, আমার মতে যথেষ্ট লাভবান একটি অভিজ্ঞতা ।

তবে রাতের সময় গ্রামের মাধুরী যেন চাঁদের আলোয় আরো বেশি হয়ে যায়। শহরের মত অতটা উন্নত ও আলোকিত নয়, বরং একটু নিরিবিলি জায়গা এবং অন্ধকার রাস্তা। ঝিঁঝিঁর ডাক, চাঁদের আলো-মাখা রাস্তা ও স্রোত বয়ে চলা নদীর আওয়াজ এক অতুলনীয় অভিজ্ঞতা তৈরি করে তোলে। ওই পাহাড়ের মধ্যে ছোট-ছোট আলোর ফোঁটাগুলো যেন তারার মত দেখতে লাগে, এক স্বর্গীয় দৃশ্য !

**যাত্রাপথঃ**

কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন থেকে দার্জিলিং মেল-এ করে, এক রাতের সফরে শিলিগুড়ি ও সেখান থেকে প্রথম ২ ঘন্টায় পৌঁছে যাবেন দার্জিলিং। ইচ্ছেমতো উপভোগ করে, সেখান থেকে নেমে যেতে পারেন বিজনবাড়ি মাত্র ১.৫ ঘন্টার রাস্তায়, দার্জিলিং ট্যাক্সি-স্ট্যান্ড থেকে গাড়ি নিয়ে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যভরা ও শহরের থেকে দূরে, পাহাড়ের কোলে এই গ্রাম বিজনবাড়ি আপনার এই বছরের পুজোর ছুটি করে তুলুক এক শান্তি ভরা অনুভব।

**শুভম্**